ছোটদের সচিত্র মাসিক পত্র
ঝিলিমিলি
৩য় বর্ষ
প্রথম সংখ্যা
মাঘ ১৩৭৪

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ডকপি : শ্রুভাবতী চক্রবর্তী

স্ক্যান ও এডিট : সুজিত কুন্ডু

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

নিয়মাবলী

* ঝিলিমিলি প্রতি বাংলা মাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকাশিত হয়।

* প্রতি সংখ্যার দাম ·৪০ পয়সা। বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা সডাক ৬·০০ টাকা। বছরে দুটো বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়। বৈশাখে নববর্ষ ও আশ্বিনে শারদীয়া সংখ্যা। গ্রাহকদের বিশেষ সংখ্যার জন্য অতিরিক্ত দাম বা রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠানোর খরচ দিতে হয় না।

* নমুনা সংখ্যার জন্য ০·৪০ পয়সার ডাক-টিকিট পাঠাতে হয়।

* ঝিলিমিলির বর্ষারম্ভ মাঘ মাস থেকে। কিন্তু বছরের যে কোনো সময় থেকে গ্রাহক হওয়া যায়।

* ঝিলিমিলিতে প্রকাশের জন্য শিশু ও কিশোর মনের উপযোগী বিবিধ রচনা, চিঠিপত্র, টাকাকড়ি নগদে, মনি-অর্ডারে কিম্বা পোষ্টাল অর্ডারে সম্পাদকের নামে কার্যালয়ের ঠিকানায় পাঠাতে হবে। গ্রাহক-গ্রাহিকারা রচনা, ধাঁধা, প্রতিযোগিতা, চিঠি ইত্যাদি পাঠাবার সময় গ্রাহক-কার্ড দেখে গ্রাহক নম্বর, নাম-ঠিকানা ইত্যাদি পরিষ্কার করে লিখবে। যারা এখনো গ্রাহক-নম্বর পাওনি, তারা 'নতুন গ্রাহক' বলে উল্লেখ করবে।

* মনোনীত রচনা কোন্ সংখ্যায় ছাপা হবে সে সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা সম্ভব নয়। কপি রেখে রচনাদি পাঠানোর নিয়ম। উপযুক্ত ডাক-টিকিট না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ অথবা চিঠিপত্রের জবাব দেওয়া সম্ভব হয় না।

* ভারতের যে কোনো জায়গায় 'ঝিলিমিলি' বিক্রয়ের জন্য এজেন্সি দেওয়া হয়। এজেন্সি কমিশন শতকরা ২৫%। প্রতি এজেন্টকে কমপক্ষে ১০ কপি পত্রিকা নিতে হবে। শতকরা ১০% কপি পর্যন্ত পত্রিকা ফেরৎ নেওয়া হয়। এজেন্টদের পত্রিকা পাঠাবার খরচ আমরা বহন করবো। পত্রিকা ফেরৎ পাঠাবার খরচ এজেন্টদের। এজেন্সির জন্য ৫·০০ টাকা অগ্রিম জমা রাখতে হয়।

* বিজ্ঞাপন, পত্রিকার এজেন্সি বা অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয় চিঠি লিখলে জানানো হয়।

কর্মাধ্যক্ষ, ঝিলিমিলি

কার্যালয়: ১৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা ১২। ফোন: ৩৪-৮৮৩৭।

৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা

মাঘ ১৩৭৪

সূচীপত্র

শীতের খবর (কবিতা)
কার্তিক ঘোষ ৯
আত্মবিশ্বাসের জয় (জীবনস্মৃতি)
প্রণবকান্তি দাশগুপ্ত ১১
…শ্চর্য অতিথি (বিজ্ঞাননির্ভর গল্প)
…র সেনাপতি ১৩
এলো (কবিতা)
…ন্তা দাশ ১৯
…ক আমার মন (কবিতা)
মাহিনীমোহন গাঙ্গুলী ২০
আলোর নিচে আঁধার (উপন্যাস)
বিশ্বনাথ দে ২১
পাষাণপুরীর রাজকন্যে (নাটিকা)
বন্তিবুড়ি ২৫
শীত (কবিতা)
রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় ৩২
গোয়েন্দা গল্পের মেড-ঈজি (বিদেশী)
শ্রীহর্ষ মল্লিক ৩৩
টিনের ঝুমঝুমি (কবিতা)
পূর্ণেন্দু পত্রী ৪১
এই দেশেরই ছেলে (উপন্যাস)
নটরাজন্ ৪৪
শীত এসেছে (কবিতা)
সরোজ রায় ৪৭
অপরূপ কথা (রূপকথা)
অতীন মজুমদার ৪৮
শত্তুর শীতকাল (ছড়া)
স্বপ্না চৌধুরী ৫৩
নামকরণ (বিচিত্রা)
চুনীলাল রায় ৫৪
ভূমি এবং জল (কবিতা)
বিক্রমাঙ্ক দেব ৫৬
ভোম্বলের গোয়েন্দাগিরি (হাসির গল্প)
অসিত গুপ্ত ৫৭
শনিগ্রহের কথা (বিজ্ঞান বিচিত্রা)
নারায়ণ চক্রবর্তী ৬৩
এক যে ছিল (ছড়া)
ইন্দ্রজিৎ রায় ৬৫
ম্যাজিক মহল
এ. সি. সরকার ৬৬
সামুদ্রিক গোখরো (প্রাণী-বিজ্ঞান)
রথীন সরকার ৬৮
ঝিলিমিলির আসর—আসরবন্ধু ৭০
খেলাধুলা
পুষ্পেন সরকার ৭৫
ক্রিকেট (নিবন্ধ)
জীবনময় দত্ত ৭৭
ঝিলিমিলির কথা ৭৮

সম্পাদক : চিত্তজিৎ দে

অত্যাশ্চর্য্য
গুণাবলী
মহাভৃঙ্গরাজ তৈলের বহুবিধ গুণাবলী
সত্যই আশ্চর্য্যজনক।
SADHANA AUSADHALAYA
Dacca (Bengal)
Maha Bhringaraj
Taila
ইহা যে শুধু কেশের পক্ষেই উপকারী
তাহা নহে, মস্তিস্কের পক্ষেও পরম হিতকর।
সাধনার
মহাভৃঙ্গরাজ
তৈল
সাধনা ঔষধালয়-ঢাকা
সাধনা ঔষধালয় রোড কলিকাতা- ৪৮
কলিকাতা কেন্দ্র—ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম, বি, বি, এস, (কলিঃ) আয়ুর্বেদাচার্য্য
SA 5/60
অধ্যক্ষ শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম. এ.
আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ, সি, এস, (লণ্ডন) এম, সি, এস, (আমেরিকা)
ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

নবাবী আমল
বিমল মিত্র

বিমল মিত্রের লেখা ভারি মিষ্টি। তার ওপর উপস্থাপিত কাহিনী যদি রমণীয় হয়— তবে তো কথাই নেই। সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা দেশকে কেন্দ্র করে যে কাহিনী তিনি গেঁথেছেন— সত্য আর কল্পনায় মিশে তা খুবই মনোগ্রাহী হয়ে উঠেছে। দাম ৫.০০

রূপ-কথা
দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

শিল্পী যখনঃ তুলি ছেড়ে লেখনী ধরেন তখনো তিনি ছবি এঁকে চলেন। সে ছবি আঁকা হয় ভাষায়···ছন্দে···কাহিনীতে। রূপকথার কাহিনীগুলিও তেমনি এক একটি ছবি মন্দিরকেন্দ্রিক ভারতের আত্মার। লেখনী আর তুলি মিশিয়ে শ্রীমুখোপাধ্যায় যে ছবি উপহার দিয়েছেন তার আবেদন আর সৌন্দর্য চিরকাল ধরে মনে রাখার মতো। দাম ২.৫০

কুহকের দেশে
প্রেমেন্দ্র মিত্র

বিজ্ঞান-ভিত্তিক রোমাঞ্চের উপন্যাস লেখায় শ্রীমিত্রের তুলনা হয় না। সাহিত্যের এই শাখাটি মূলতঃ তাঁরই প্রচেষ্টায় উন্মুক্ত হয়েছে কিশোর-কিশোরীদের কাছে। এই বইটি তাঁর অমলিন খ্যাতিকে আরো উজ্জ্বল করে তুলবে। দাম ২.৫০ টাকা।

শ্রী প্রকাশ ভবন
১৯, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২

ছোটোদের জন্য শ্রী প্রকাশ ভবনের সংবাদ !

শ্রী প্রকাশ ভবন বাংলা দেশে ছোটোদের প্রকাশনা-জগতে প্রথম সারিতে অতি অল্প দিনের মধ্যেই নিজেদের স্থান করে নিয়েছেন।

শ্রী প্রকাশ ভবন— খ্যাতনামা সাহিত্যিকদের লেখা ছোটোদের মনের মতন গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ভ্রমণ-কাহিনী, রূপকথা, খেলার কথা, বিজ্ঞান-জগতের গল্প, হাসির, ভূতের ও পশুরাজ্যের বহু বিচিত্র গল্প ইত্যাদি নানা বিষয়ের ওপর বহু গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন।

শ্রী প্রকাশ ভবন— শুধু বাংলা দেশেই নয় সারা ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যাঁরা শিশু সাহিত্যের ওপর পর পর তিন বছর ভারত সরকার ও য়ুনেস্কোর শ্রেষ্ঠ চারিটি পুরস্কার ঘরে তুলেছেন।

শ্রী প্রকাশ ভবনের বই মানেই রুচি, আনন্দ ও শ্রেষ্ঠত্বের চমৎকার নিদর্শন !

শ্রী প্রকাশ ভবন— বাংলা দেশের শ্রেষ্ঠ ও সম্ভ্রান্ত শিশু ও কিশোর সাহিত্যের অন্যতম প্রকাশক।

ছোটোদের মুখে খুশির ঢেউ তুলতে হলে তাদের শ্রী প্রকাশ ভবনের বই উপহার দিন।

শ্রী প্রকাশ ভবন

১৯ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলকাতা-১২

ফোন : ৩৪-৮৮৩৭

ছোটোদের ক'টি মন-কাড়া বই

দেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের
রূপ-কথা ২·৫০

বুদ্ধদেব বসুর
হামেলিনের বাঁশিওলা ২·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র ও লীলা মজুমদারের
হট্টমালার দেশে ২·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্রের
ভানুমতীর বাঘ ২·০০

আশাপূর্ণা দেবীর
ভালো ভালো গল্প ২·০০

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের
মানুষের প্রথম অ্যাডভেঞ্চার ২·৫০

ইন্দ্রজিৎ রায় সম্পাদিত
আহ্লাদে আটখানা ৫·০০

বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত
পশুরাজ্যের কাহিনী ৮·০০

শ্রী প্রকাশ ভবন

১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-১২
ফোন : ৩৪ ৮৮৩৭

শিশুদিগের যকৃৎ রোগে উপকারী

সুস্থ শিশুকেও মধ্যে মধ্যে কালমেঘ সেবন করাইলে লিভারের দোষ হইবার সম্ভাবনা থাকে না

বেঙ্গল কেমিক্যালের
কালমেঘ

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র মতে কালমেঘ তিক্ত, অগ্নিদীপক, বলকারক ও পিত্তনিঃসারক

ইহা আবালবৃদ্ধ সকলের পক্ষেই হিতকর

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর

কফিন জাহাজ

(২য় মুদ্রণ)

বিশু মুখোপাধ্যায়

জলদস্যু, বোম্বেটে, খুনে, ডাকাত— এই সব ভয়ঙ্কর দলের উপাখ্যান। সত্য ঘটনার সাবলীল বিবরণ। এবং এটা তো ঠিকই— সত্য ঘটনা অনেক সময়েই কল্পনার চেয়ে বিস্ময়কর।

[৩·০০]

চুরি গেলেন হর্ষবর্ধন

(২য় মুদ্রণ)

শিবরাম চক্রবর্তী

রোমহর্ষক গোয়েন্দা-কাহিনীর 'প্যারডি' লিখেছেন লেখক। ফলে ঠাট্টায়, কৌতুকে, কথার খেলায় এই কাহিনী আশ্চর্য এক হাস্যরসের পরাকাষ্ঠায় পরিণত হয়েছে। এর ওপর আবার রয়েছে রেবতীভূষণের আঁকা ছবি। [২·০০]

অশরীরী আতঙ্ক

(২য় মুদ্রণ)

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

শ্বাসরোধী পরিবেশ, কৌতূহলের তীব্রতা, আশঙ্কা— এইসব উপাদান নীহাররঞ্জন এমন আশ্চর্যভাবে ব্যবহার করেন, যার ফলে শেষ পাতা পর্যন্ত পড়তে হয়। লেখকের এই জনপ্রিয় উপন্যাসটি পূর্বখ্যাতিকেও ম্লান করে দিতে উৎসুক। [৪·০০]

শ্রী প্রকাশ ভবন

১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

জয়তু নেতাজি

৩য় বর্ষ : ১ম সংখ্যা   মাঘ ১৩৭৪

শীতের খবর

কার্তিক ঘোষ

শীত শীত শীত কনকনে শীত, শীতের খবর এলো—
ফুর ফুরানি হিমেল হাওয়া বইছে এলোমেলো !
শীতের খবর, খুশির খবর, রোদের পাখি হাসে,
সাত-সকালে জানলা খুলে ঘুম ভাঙাতে আসে।
নীল ঝিলমিল আকাশটাতে নাম না জানা পাখি,
ওদের কাছে শীতের খবর পৌঁছে গেছে নাকি ?
হিম ঝুরঝুর ভোরের বেলা হিমের কুচি ঝরে···
টিনের চালে, গাছের পাতায়, ফুল-ফুলালির পরে।
শীত এসেছে, শীতের খবর— সূয্যি ঠাকুর জানে,
তাই বুঝি রোজ সকাল হলেই আলোর ঝারি আনে।
মিষ্টি আলোর বিষ্টিতে তাই ছোট্ট হাঁসের ছানা,
দিব্যি কেমন চান করেছে নাচছে তা-তিন-তা-না !
শীত এসেছে, শীতের খবর— মোরগ চাঁপার ডালে,
বকম বকম পায়রা দুটো চুপটি খড়ের চালে।
কাঠবেড়ালীর ছোট্ট ছানা, কি খুশি তার মনে,
শিশির ফোঁটা হাসছে তো বেশ সবুজে ঘাসের বনে।

শীত এসেছে, শীতের খবর— ছোট্ট পেঁপে গাছে···
'বৌ কথা কও' হলুদ পাখি দিব্যি এসে নাচে।
রোদ ঝুর ঝুর গাঁদার বনে হলুদ হলুদ ফুল—
ফুরফুরানি হিমেল হাওয়ায় দুলছে দোদুল দুল!
শীত এসেছে, শীতের খবর— হিম কুয়াশায় ঢাকা,
সবুজ ধানের মাঠটাতে আজ সোনার ছবি আঁকা।
সোনার ছবি রূপ্‌লি আলোয় ঝিকির মিকির করে,
ঝাপুর ঝুপুর হলুদ দুপুর খুশিতে বুক ভরে।
শীত এসেছে, শীতের খবর— পরজাপতি দিলে,
উদাস-উদাস-নদীর ধারে, শালুক ফোটা ঝিলে।
জল টলমল, কাজল কালো দিঘির ধারে, আর—
শিমুল ডাঙার মাঠ পেরিয়ে তেপান্তরের পার।
শীত এসেছে, শীতের খবর— জোনাক জ্বলা সাঁজে,
হিম কুয়াশার মধ্যে কেমন ঝিঁঝিঁর ঝাঁঝর বাজে।
অনেক দূরের আকাশটাতে একফালি চাঁদ ভাসে—
এত্তোটুকুন উঠোন বাড়ি সেই খুশিতে হাসে!
শীত এসেছে, শীতের খবর ইতুন পেলো আর··
পুতুল বাড়ি খবর দিল, খেলার ঘরে তার!
লাল সোয়েটার বাক্স খুলে বেরিয়ে এলো তাই—
হিম্ কন্ কন্ শীতের খবর সবাই জানে ভাই।
শীত এসেছে শীতের খবর— শীত বুড়োটা লেখে,
নীল ঝিলমিল মটর শুঁটির ফুলগুলিকে দেখে।
শীত কন্‌কন্ শীতের বুড়ি খবর ছড়ায় বেশ—
ঝরনা, পাহাড়, মাঠ, নদী, বন, খোকা-খুকুর দেশ!
শীত এসেছে, শীতের খবর— বড্ড লাগে মিঠে—
ছ্যাঁক কল কল রান্না ঘরে ঠানদি' ভাজে পিঠে!
সেই খুশিতে নাচছে ইতুন, মিতুন, পুপুন, লিলি—
শীত এসেছে, শীতের খবর— হাসছে ঝিলিমিলি!

জীবনস্মৃতি

আত্মবিশ্বাসের জয়

প্রণবকান্তি দাশগুপ্ত

'কি নাম তোমার?' নতুন ছেলেটিকে জিগ্যেস করলেন সংস্কৃতের পণ্ডিত বিশ্বনাথ কাব্যতীর্থমশাই।

'শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু।' স্পষ্ট উচ্চারণ করলো নতুন ছেলেটি।

'কোন্ স্কুলে পড়তে আগে?'

'প্রোটেষ্টান্ট য়ুরোপিয়ান স্কুলে।'

'কি শিখেছো সেখানে? সংস্কৃত জানো? ধাতুরূপ? শব্দরূপ?'

'না।'

'না! লজ্জা করে না বলতে?'

লজ্জা করে বৈকি। খুব করে। কিন্তু যা সত্য তাইতো বলতে হবে। মিথ্যে বলতে যে শেখেনি সুভাষচন্দ্র।

'তা বাংলা কদ্দুর শিখেছো?' খেঁকিয়ে উঠলেন কাব্যতীর্থমশাই।

'বাংলা ওখানে পড়ানো হতো না, স্যর।' মাথাটা একটু নত হয়ে গেলো সুভাষচন্দ্রের।

'সে কি গো!' বলে কাব্যতীর্থমশাই চোখ-মুখের এমন ভয়ঙ্কর অবস্থা করলেন, যেন এর চাইতে বড়ো অপরাধ আর হয় না। 'নিজের মাতৃভাষাই জানো না? ওরা তোমায় মায়ের নাম ভুলিয়ে ছেড়ে দিয়েছে, দেখছি!'

পণ্ডিতমশাইর এহেন বিদ্রূপে বেশ মজা পেলো ছেলেরা। হো-হো করে হেসে উঠলো তারা।

সহ্য হলো না সুভাষচন্দ্রের। ঘাড় উঁচিয়ে দাঁড়ালো। বললো, 'শিখে নেবো, স্যর। দু'দিনেই শিখে নেবো।'

'বাংলা না হয় শিখলে, সংস্কৃত?'

'তাও শিখে নেবো।'

খ্যাক খ্যাক করে এক অদ্ভুত ভঙ্গিতে হেসে উঠলেন পণ্ডিতমশাই। ছোঁড়া বলে কি? তাচ্ছিল্যে ঠোঁট বেঁকালেন তিনি। পুরোনো ছেলেদের বললেন, 'এর চাইতে যে হিমালয় পর্বত উপড়ে ফেলা সহজ রে, তাই না?'

'হ্যাঁ।' ছেলেদের নোয়ানো ঘাড়ে মৌন সম্মতি। যেখানে শব্দরূপ একখানা মুখস্থ করতে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কেটে যায়, সেখানে সংস্কৃতে ও কিনা রাতারাতি পণ্ডিত হয়ে যাবে! এ যে পাগলের প্রলাপ!

'এই কলা শিখবে তুমি, বুঝেছো?' সুভাষচন্দ্রের দিকে বুড়ো আঙুলটি তুলে বললেন পণ্ডিতমশাই।

বছরের শেষ। বার্ষিক পরীক্ষার পর। ছুটির ঘণ্টা পড়তেই ছেলেরা হুড় হুড় করে ক্লাশ থেকে বেরোতে লাগলো।

হেডমাষ্টার বেণীমাধববাবু গম্ভীর গলায় ডাকলেন, 'এই চারু, শোনো।'

ভিড়ের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এলো একটি ছেলে।

'এবার তোমাদের ক্লাসে ফার্ষ্ট হলো কে?'

একটু ইতস্ততঃ করেই উত্তর দিলো চারু, 'সুভাষ, স্যর।'

খুশি হলেন বেণীমাধববাবু। অনুমান তাঁর মিথ্যে নয়। প্রথম দিনেই তিনি চিনতে পেরেছিলেন, তার ভেতরে কিছু আছে। বুক-ভরা যার অফুরন্ত উদ্দীপনা, মনে যার কঠিন সঙ্কল্প, হৃদয়ে যার আত্মবিশ্বাসের অনির্বাণ শিখা, সে কি কখনো পিছিয়ে থাকতে পারে? কৌতূহল মেটেনি বেণীমাধববাবুর। জিগ্যেস করেন আবার, 'সুভাষ সংস্কৃতে কতো পেয়েছে?'

'একশো স্যর!' এবার চারু খুশিতে যেন ডগমগ! এমন অদ্ভুত খবর দিতে পারলে কে না খুশি হয়? বছরের প্রথমে যে সুভাষ সংস্কৃতের 'স'-ও জানতো না, সে-ই শেষে পরীক্ষায় একেবারে একশো পেলো!

অফিসঘরে পণ্ডিতমশাইকে ডেকে আনলেন বেণীমাধববাবু। কৌতুক করে বললেন, 'সুভাষকে কি সারাজীবনের নম্বর একবারেই দিয়ে দিলেন নাকি?'

পণ্ডিতমশাই হাসলেন। বললেন, 'কি করবো বলুন, একশো-এক দেবার উপায় ছিলো, কিন্তু নিরানব্বুই দেবার উপায় ছিলো না। ওর যা মেধা!'

'শুধু মেধা নয়', সগর্বে বললেন বেণীমাধববাবু, 'এ হচ্ছে আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাসের শক্তিতে সুভাষ শক্তিমান।'

'সত্যি, ছেলেটা যেন আত্মবিশ্বাসের মূর্ত প্রতীক।' স্বীকার না করে পারলেন না পণ্ডিতমশাই। যিনি একদিন সুভাষচন্দ্রকে ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছিলেন, তিনিই আবার তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন।

★

বিজ্ঞাননির্ভর গল্প

আশ্চর্য অতিথি

শ্রীধর সেনাপতি

অদ্ভুত চাপা ছেলে এই পার্থ।

মাথা ফাটিয়ে রক্তরঞ্জিত জামাকাপড় নিয়ে যখন সে বাড়ি এলো, তখন বাড়িতে সে কি হৈ চৈ! একি! কী হলো? কে মারলো? কোথায় — কখন? উদ্বেগ উৎকণ্ঠা এবং আশঙ্কায় মা বাবা দাদা, এমনকি ছোট্ট বোনটি পর্যন্ত যখন একটার পর একটা প্রশ্ন করে যাচ্ছিলো— পার্থ তখনও মুখ খোলে নি। তার পরও একটা চাপা মৃদু হাসি ঠোঁটের ওপরে যেন ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছিলো পার্থর।

সংবাদ পেয়ে ডাক্তারবাবু ছুটে এলেন।

নতুন করে আবার সেই প্রশ্নের পর প্রশ্ন। অবশেষে পার্থ উত্তর দিলো, 'একটা আধলা ইট কোথা থেকে ছুটে এসে মাথায় পড়ে গেলো আচমকা!'

ব্যস। ওই পর্যন্ত! এর বেশি সে নিজেই জানে না তো অপরকে বলবে কী ?

বাড়ির মতোই, গ্রামের সব মানুষ জানে, পার্থ ভালো ছেলে। শান্ত, সুবোধ! কারোর সঙ্গে সে যে ঝগড়া মারামারি করতে পারে, এমন সম্ভাবনার কথা কেউ মনেও আনে না। পার্থ মিথ্যাবাদীও নয়। সুতরাং তার কথা বিশ্বাস করে, সহানুভূতির সঙ্গে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া, আর কিছু করার উপায় ছিলো না তখন।

অতঃপর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হয়েছে। ডাক্তারবাবুর মতে আঘাতটা খুব সামান্য নয়। চিকিৎসার সঙ্গে চাই পূর্ণ বিশ্রাম। কাজেই, দ্বিতলের একটি ঘরে দিনরাত্রি বন্দী হয়ে থাকবার কথা পার্থর।

এমনই একটা ব্যবস্থা পার্থ মনে মনে চেয়েছিলো।···

পার্থর ঘর থেকে রায়দের পোড়োবাড়িটা সম্পূর্ণ দেখা যায় না। আম- কাঁঠালের বাগানটা টপকে চিলেকোঠাসহ ছাদের একাংশ দৃষ্টিপথে পড়ে এখান

থেকে। দেখা যায় বাড়ির ভগ্ন প্রবেশপথের কিছুটাও। বাকি অংশ হারিয়ে গেছে পুরোনো আম-কাঁঠাল এবং জামরুল গাছের অন্তরালে।

একদিন জানলার কাছে বসে অনেক রাত্রি পর্যন্ত পার্থ পড়াশুনা করছিলো। শুক্লপক্ষ। থালার মতো চাঁদটা তখন রায়দের বাড়ির চিলেকোঠার পাশ থেকে উঁকি মারছিলো। পার্থ দুলে দুলে মুখস্থ করছিলো একটা বাংলা কবিতা। দৃষ্টিটা তার বার বার ছুটে যাচ্ছিলো বাইরের দিকে, রায়দের পোড়োবাড়ির ছাদের ওপরে। সহসা চমকে উঠেছিলো সে। একি! ছাদের ওপরে কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে!

কবিতা মুখস্থ করার চেষ্টা ব্যাহত হলো পার্থর। কৌতূহলী হয়ে সে তাকিয়ে রইলো সেইদিকে। হ্যাঁ, ঠিকই তো। একটা ছেলে। তারই সমবয়সী। কে ও? ও বাড়িতে তো বহুদিন হলো কেউ থাকে না, তাহলে?

পার্থ ভূতে বিশ্বাস করে না। তবে ভূতের গল্প পড়তে তার মজা লাগে। পোড়োবাড়িতেই যে ভূতের উপদ্রব বেশি, একথা গল্প পড়ে এবং লোকের মুখে এতোদিন ধরে শুনেই এসেছে সে কিন্তু বিশ্বাস করেনি।

পার্থ সামান্য একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলো হয়তো। হঠাৎ সে সচকিত হয়ে দেখলো, ছেলেটি আর ছাদে নেই! অন্ততঃ তাকে আর দেখা যাচ্ছে না। তবে কি সে ভুল দেখলো? না কি লুকিয়েই পড়েছে ছেলেটা? বার বার চেষ্টা করেও ছেলেটির দর্শন আর পেলো না পার্থ।

ঘটনাটি বাড়ির কারোর কাছেই সে প্রকাশ করলো না— যদিও রীতিমতো একটা রহস্যের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।

দ্বিতীয় দিন রাত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি!

তাইতো! কে ওই ছেলেটি? তারপর থেকে কতোরকম সম্ভাবনার কথাই না মনে জাগতে লাগলো পার্থর। কোনো কোনো দুষ্ট প্রকৃতির লোক এই রকম ভাঙা পোড়োবাড়িতে আশ্রয় নেয় অনেক সময়ে, গল্প শুনেছে সে। ছেলেটি সেই দলের কেউ নয় তো? কিম্বা ছেলেটি হয়তো দিনের বেলায় পথে পথে ভিক্ষে করে বেড়ায়, রাত্রে এসে আশ্রয় নেয় ওই বাড়ির ছাদে? ছেলেটির বুকে কি ভয়ডর নেই এতোটুকু? পোড়োবাড়িতে যে সাপের আড্ডা থাকে! রাত্রে কেউ যায় ওখানে?

ভাবতে ভাবতে অনেক রাত্রি পর্যন্ত দু'চোখের পাতা এক করতে পারছিলো না পার্থ! কৌতূহলে ছটফট করছিলো। শেষরাত্রে যদিও বা একটু তন্দ্রা এসেছিলো, আচমকা সে ঘুম ভেঙে গিয়েছিলো অতি প্রত্যূষে।

আর ঘুম ভাঙার সঙ্গে সঙ্গে কী একটা শক্তি যেন তীব্রভাবে আকর্ষণ করে টেনে নিয়ে গিয়েছিলো পার্থকে জানলার ধারে। পার্থ দেখতে পেলো, একটি ছেলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো ধীরপদে।

কৌতূহল ক্রমশ অদম্য হয়ে উঠছিলো পার্থর। বাড়ির অনেকের তখনও ঘুম ভাঙেনি। পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামলো সে। পিছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে ফলের বাগানটি অতিক্রম করলো দ্রুতপায়ে। অতঃপর ঢুকে পড়লো সে রায়দের পুরোনো বাড়িতে। অতি সন্তর্পণে ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে পার্থ ছাদের ওপরে উঠে এলো। ছাদে লক্ষ্য করার মতো কিছুই দেখতে পেলো না সে। চিলেকোঠার অন্ধকার সম্পূর্ণভাবে কেটে গেছে তখন। নরম আলো ভেতরে ঢুকেছে। কাঠ, ভাঙা ইঁট, ধুলো-বালি— ঝড়ে উড়ে-আসা গাছের শুকনো পাতায় ছোট্ট কুঠুরিটা প্রায় পূর্ণ হয়ে রয়েছে। আর কিছু— ওটা কী? পাতলা কাপড়ের মতো একটা জিনিস ভাঁজ করা রয়েছে। ছেলেটির বিছানা নাকি! একটু বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতেই পার্থর মনে হলো, জিনিসটা কাগজ বা কাপড় জাতীয় কোনো বস্তু নয়। অন্ততঃ পার্থ এ জিনিস কখনও দেখেনি। আসলে বস্তুটা কী? আলোয় সামান্য চিকচিক করছে।

পার্থ সেটার ভাঁজ খুলে ফেললো। রাখলো মেঝের ওপরে। চৌদ্দ-পনেরো বছরের একটি ছেলের আকৃতি। ওই ছেলেটিরই পোশাক নাকি? কিন্তু বড়োই বিচিত্র। মাথা, হাত, দেহ, পা সবই আছে। অথচ ওই পোশাকের ভেতরে ছেলেটি তার দেহ ঢোকাতে পারবেনা। এর কোনো অংশই উন্মুক্ত নয়। শুধু মাথার কাছে সামান্য একটা ছিদ্রের মতো দেখতে পেলো পার্থ। ঠিক যেন— পার্থর মনে হলো, একটা ছেলের ওপর দিয়ে ভারি ষ্টীম-রোলার চালিয়ে তার দেহের চামড়াটুকু ছাড়া ভেতরের রক্ত, মাংস, হাড় ইত্যাদি সবকিছু পিষে মাথায় ভেতর দিয়ে বের করে দেওয়া হয়েছে! চামড়ার খোলসটা পড়ে আছে শুধু মানুষের দেহের আকারে। এমন অদ্ভুত বিস্ময়কর জিনিস পার্থ কোনোদিন দেখেনি। চৌদ্দ পনেরো বছরের ছেলের আকারে তৈরি যেন একটা বায়ুশূন্য বেলুন! অথচ মাথায় সোনালী চুল আছে। চোখের জায়গায়— পার্থ কাঁপাহাতে চোখের পাতা সামান্য একটু টেনে তুলে দেখলো— চোখও আছে। নীলাভ, আর্দ্র— কিন্তু চ্যাপ্টা।

সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেলো পার্থর। বিস্ময়ের চমক খেয়ে ঘামতে ঘামতে পুনরায় জিনিসটাকে সে আগের মতোই ভাঁজ করে ফেললো।

সেটাকে যথাস্থানে রেখে তাড়াতাড়ি নেমে এলো নিচে। বাড়িটার দিকে এবার থেকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখবে সে। জিনিসটা যে ওই ছেলেটিরই সম্পত্তি, এ বিষয়ে পার্থর মনে যেন কোনো সন্দেহই রইলো না। তার ধারণা হলো, ছেলেটি আবার এখানে ফিরে আসবেই!

রায়বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবার সময়ে ওপর থেকে একটা ভাঙা ইঁটের টুকরো কীভাবে যেন এসে পড়েছিলো পার্থর মাথায়। সেই আঘাতের চেয়ে বিস্ময় এবং কৌতূহল বেশি থাকায় পার্থ তার দৈহিক ক্লেশটা তীব্র ভাবে অনুভব করতে পারেনি। দ্রুত বাড়ি চলে এসেছিলো সে!

এখন ঘরের মধ্যে বন্দী থাকতে হবে!

পার্থর পক্ষে এটা যেন আশীর্বাদ হয়ে গেলো। সারাক্ষণ এই জানলার ধারে বসে রায়বাড়ির দিকে লক্ষ্য রাখতে পারবে সে। রহস্যটা উদ্‌ঘাটন করতে হবেই। আর যতোক্ষণ সেটা উদ্‌ঘাটিত না হচ্ছে, দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তিকে ততোক্ষণ এ সম্বন্ধে কোনো কথাই সে বলবে না— পার্থ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো।

হাতের কাছে রেখেছিলো সে দাদার বাইনাকুলারটা।

পার্থর অনুমান মিথ্যে হয়নি।

সন্ধ্যের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে ছেলেটিকে রায়বাড়ির মধ্যে ঢুকতে দেখা গেলো।

পার্থর শরীরের সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে!

সন্ধ্যের সময়েই চাঁদ উঠেছে। রায়বাড়ির ছাদের একাংশ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে চাঁদের আলোয়, দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে সেদিকে তাকিয়ে রইলো পার্থ। ছেলেটাকে ছাদের ওপরে এখনও দেখা যাচ্ছে না কেন? আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলো নাকি? কিম্বা হয়তো ছাদের এমন জায়গায় রয়েছে, এখান থেকে যে অংশটা দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু না— ওই যে একেবারে দৃষ্টির সামনে··· ছাদের ওপরে এসে দাঁড়িয়েছে ছেলেটি।

পার্থ দেখতে পেলো, ছেলেটির হাতে ভাঁজ করা সেই জিনিসটা। ওটা তাহলে ছেলেটিরই। ছেলেটি সেটার ভাঁজ খুললো। ছাদের ওপরে লম্বা করে ছড়িয়ে রাখলো সেটাকে— পার্থর জানলার কাছ থেকে মনে হতে লাগলো, যেন একটা মানুষের দেহের ছায়া পড়লো লম্বাভাবে। ছেলেটিও তারপর সেই জিনিসটার মাথায় নিজের মাথা ঠেকিয়ে বিপরীত দিকে হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো।

শুয়েই রইলো একভাবে। সে দৃশ্য দেখতে দেখতে পার্থর চোখের দৃষ্টি ক্লান্ত হয়ে পড়লো এক সময়ে। তবে কি ওইভাবে ঘুমিয়ে পড়লো ছেলেটা? কিন্তু তা হলে জিনিসটাকে ওভাবে রাখার উদ্দেশ্য?

পার্থ অল্পক্ষণের জন্যে দূরবীন নামালো চোখ থেকে। চোখদুটো রগড়ে নিয়ে আবার দূরবীনের ভেতর দিয়ে দেখলো—ছেলেটি নিশ্চলভাবে একই ভঙ্গিতে শুয়ে রয়েছে! কিন্তু দেহটা তার আগের চেয়ে অনেক শীর্ণ দেখাচ্ছে! আর, তার বিপরীত দিকের সেই রহস্যময় জিনিসটা একটা কিশোর বালকের মূর্তি পরিগ্রহ করছে ধীরে ধীরে। অর্থাৎ একটা দেহ থেকে আর একটা দেহ রূপ নিচ্ছে!

উত্তেজনায় পার্থর শ্বাস যেন রুদ্ধ হয়ে এলো! পৃথিবীতে এমন আশ্চর্য ঘটনাও কি সম্ভব?

ঠিক এমনি সময়ে দুধের বাটি হাতে পার্থের মা ঘরে ঢুকলেন—'দুধটুকু খেয়ে শুয়ে পড় পার্থ! সারাদিন তো দেখছি জানলার ধারে বসে আছিস। এবার শুয়ে পড়।'

ওদিকে ছেলেটিও প্রতিদিনের মতো অদৃশ্য হয়ে গেছে তারপর।……

পার্থ রাত্রে ঘুমোতে পারলো না। মনে মনে সে ঠিক করলো, কাল সকালে ছেলেটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেই, তার ওই ভাঁজকরা খোলসটি সে

হস্তগত করে বাড়িতে নিয়ে আসবে তারপর রাত্রে ছেলেটি ফিরে এসে জিনিসটাকে না পেলে কী করে দেখা যাবে।

পরদিন সকালে ছেলেটি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেই পার্থ রায়বাড়িতে ছুটে গেলো। নিয়ে এলো সেই ভাঁজকরা খোলসটিকে নিজের ঘরে।...

সন্ধ্যা অতিবাহিত হলো। রায়বাড়িতে প্রত্যাবর্তন করতে দেখা গেলো সেই ছেলেটিকে। জ্যোৎস্না রাত। দূরবীনটা চোখে লাগিয়ে পার্থ রায়বাড়ির ছাদের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে লক্ষ্য করলো— ছেলেটি পাগলের মতো ছাদময় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। তাকে কখনো দেখা যাচ্ছে, আবার কখনো দেখা যাচ্ছে না! খোলসের মতো জিনিসটাকে খুঁজে না পেয়েই কি ছেলেটি অমন ছটফট করছে?

দৃশ্যটা দেখে প্রথমে বেশ মজা লাগলো পার্থর! একটা অসহনীয় যন্ত্রণায় যেন কুঁকড়ে যাচ্ছে ছেলেটি! তার পরেই পার্থ দেখলো, দেহের সমস্ত শক্তি হারিয়ে সে লুটিয়ে পড়লো ছাদের ওপরে।

নিজের কৌতূহল মেটাতে গিয়ে একি করলো পার্থ? সে তো চায়নি যে ছেলেটি অসুস্থ হয়ে পড়ুক ওইভাবে, কিম্বা মৃত্যু ঘটুক তার।

অবশেষে মৃত্যুই হলো বোধহয় ছেলেটির!

তার স্থির নিশ্চল দেহ ছাদের ওপরে পড়ে রয়েছে, পার্থ স্পষ্ট দেখতে পায়।

কিন্তু পার্থ কেমন করে জানবে ওই খোলসের মতো বস্তুটার সঙ্গে তার দেহের পরিবর্তন সাধনে সামান্য একটু বিলম্ব ঘটলেই সর্বনাশ হবে? এ পৃথিবীর কোনো মানুষের পক্ষে দেহের এমন বিস্ময়কর পরিবর্তন সাধন করা কি আদৌ সম্ভব, না কল্পনা করতে পারে কেউ? অথচ ওই ছেলেটি— হ্যাঁ, নিশ্চয়ই অন্য কোনো গ্রহ থেকে পৃথিবীতে এসেছিলো। দিনের বেলা পৃথিবীর মানুষের রূপ নিয়ে ঘুরে বেড়াতো এদিক ওদিক— রাত্রে নির্জনে ধরতো তার আসল রূপ— ভিন্ন গ্রহের মানুষ। পার্থ তার বাবার কাছে শুনেছে, পৃথিবীর মানুষ চাঁদে যাবার জন্যে যেমন তৈরি হচ্ছে এবং উনিশ শো সত্তর সালের মধ্যে চাঁদে অবতরণের আশা রাখে; তেমনি অন্য কোনো গ্রহ থেকে সেখানকার মানুষও তো এ পৃথিবীতে নেমে আসতে পারে। ছেলেটি কি ভিন্ন গ্রহ থেকে মহাশূন্য গাড়ি দিয়ে এখানে এসেছিলো? কে বলতে পারে? আর সত্যিই যদি এসে থাকে, পার্থ মনে মনে বললো— ভিন্নগ্রহবাসী ছেলেটির আচার-আচরণ, শরীর-প্রকৃতি সে জানবে কী করে? সে ভেবেছিলো, ছেলেটি তার জিনিসটাকে না পেয়ে খোঁজাখুঁজি করবে, আর পরদিন সেটাকে নিয়ে পার্থ স্বয়ং হাজির

হবে তার সামনে। সব রহস্যের জট তখন খুলতে সক্ষম হবে পার্থ।

কিন্তু তা আর হলো কই ?

পার্থ দূরবীন চোখে লাগিয়ে আবার তাকালো রায়বাড়ির ছাদের দিকে। একটা উজ্জ্বল আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেলো তার। সে চোখ বুজে ফেললো। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে।

পরদিন গ্রামে ভীষণ হৈ চৈ। সকলের মুখে এক কথা। গত রাত্রে মহাকাশ থেকে একটি উল্কাপাত হয়েছে নিশ্চয়ই। সেটা পড়েছে রায়বাড়ির ছাদে। একটা চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়েছিলো গ্রামের দূর প্রান্ত পর্যন্ত। অনেকেই আলোটা লক্ষ্য করেছে।

কিন্তু পার্থ কোনো মন্তব্য করেনি কারো কাছে। খুবই চাপা ছেলে তো! পরে সে দূরবীনের সাহায্যে দেখেছিলো, আগুনে পুড়ে কালো হয়ে গেছে রায়দের পোড়োবাড়ির ছাদটা! তারপর খোলসটিকে হাতে নিয়ে যখন আর একবার সেটাকে ভালো করে দেখতে গেলো, তখন তার হাতের আঙুলের ফাঁক দিয়ে বালির মতো ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ে গেলো সেটা মাটিতে! আর সেই সঙ্গে একটা ক্ষীণ দুর্গন্ধ আশপাশের হাওয়াকে ভারি করে তুললো মাত্র।

বিষাদে ভারি হয়ে গেলো পার্থর মনটা।

●

শীত এলো

কান্তা দাস

চুপি চুপি আজকে রাতে ধরণীর হৃদয় পরে
ওড়না ঢেকে শীত এলো যে হিমেল হাওয়া চড়ে।
লাগলো কাঁপন ডালে ডালে, শিশির ভেজা ঘাসে,
খবার কিছু হিমেল বায়ে নতুন করে আসে।
শরৎ মেঘের খেলার শেষে আকাশ ছিলো নীল
চড়ুই পাখি ব্যস্ত ছিলো, উড়ছিলো গাঙচিল।
খবর হঠাৎ পেলো তারা— শীত আসছে ভাই
পাতায় পাতায় বিদায় গাথা উঠলো বেজে তাই।
ধরার বুকে শীতের সাথে জাগলো নতুন সুর :
বইছে বায়ু উত্তুরে আর কী মধু রোদ্দুর।

মুগ্ধ আমার মন

মোহিনীমোহন গাঙ্গুলী

আমার গাঁয়ের শ্যামল শোভায় মুগ্ধ আমার মন :
মুক্তাকাশে বেড়ায় ভেসে তাই সে অনুখন।
লতায় পাতায় গাছে গাছে—
প্রাণের স্মৃতি জড়িয়ে আছে
এ যেন মোর নিত্য কালের
প্রেমের বৃন্দাবন ॥
সদ্যফোটা যুঁই চামেলি ডাকছে ইশারায়—
বাঁশির সুরে মন-যমুনা উজান বয়ে যায়।
নদীর গানে—পাখির সুরে—
ঢেউ জাগে মোর হৃদয় পুরে।
পথের ধূলি ব্রজের ধূলি
চায় যে আলিঙ্গন ॥
গাঁয়ের মাটি সোনার কাঠি স্পর্শ মণি রে—
মুক্ত হতে চাই না তাহার বাঁধন ছিঁড়ে রে।
ফুলের মতো মাটিতে তার—
ফুটবো এবং ঝরবো আবার
মনের আশা ভালোবাসা
করবো সমর্পণ—
আমার গাঁয়ের সবুজ শোভায় মুগ্ধ আমার মন ॥

গোয়েন্দা উপন্যাস

আলোর নিচে আঁধার

বিশ্বনাথ দে

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

অশোকবাবু জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ পাঠিয়েছি। মৃগাঙ্কদা এখুনি এসে পড়বে।'

লন পেরিয়ে একতলা বাংলো ধরনের বাড়ি সুধাকান্তবাবুর। টানা একটা বারান্দা পেরিয়ে অশোকবাবুর পেছনে পেছনে আমরা সেদিকে এগিয়ে চললাম। অশোকবাবু ম্লান হেসে আমাদের দিকে ফিরে একবার বললেন, 'আপনারা শিল্পী সাহিত্যিক মানুষ— একটু ভালো করে আলাপও করতে পারলাম না আজ।'

হিমাদ্রি বললো, 'ঠিক আছে, এর জন্যে কি, আমরা তো এখন রইলাম এখানে ক'দিন।'

কথা বলতে বলতে আমরা ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। আর যা দেখলাম, তা একান্তই অভাবনীয়। কড়িকাঠের লোহার কড়ার সঙ্গে বাঁধা রয়েছে একটা দড়ি, আর সেই দড়ির ফাঁস শক্ত করে কামড়ে ধরে আছে সুধাকান্ত মল্লিকের গলাটা। খুবই বীভৎস আর ভয়াল মনে হলো এ দৃশ্য।

সুধাকান্তবাবুর সেই শিশুর মতন সুন্দর সরল চোখদু'টি যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। যেন সামনে একটা ভয়ঙ্কর কিছু দেখে তিনি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করার আগে একবার আর্তনাদ করে উঠেছিলেন। হাতের মুঠি দু'টি শক্ত করে কি যেন আঁকড়ে ধরে আছেন। তাঁর ঐ সৌম্য শান্ত সুন্দর দেহটি এখন আর দুলছে না, মেঝের থেকে খানিকটা উঁচুতে শূন্যে ঝুলে রয়েছে স্থির নিষ্ঠুরভাবে।

সুধাকান্তবাবুর কথা বলার ভঙ্গি, তাঁর হাসি, তাঁর হাসপাতাল তৈরির স্বপ্ন— সবই আমার চোখের সামনে ফুটে উঠছিলো। মনে পড়লো, কালও তিনি পরিহাস করে আমাদের বলেছিলেন, 'শেষ হওয়া হাসপাতালটা কি

সত্যিই আমি দেখে যেতে পারবো ?— নতুন কিছু কীর্তি স্থাপনের স্বপ্নে যে মানুষ মগ্ন ছিলেন— তাঁর এমন কি জীবনের সমস্যা দেখা দিলো— যার জন্যে এমন নিষ্ঠুর ভাবে আত্মহত্যা করতে হলো তাঁকে !

এই সবই ভাবছি, এমন সময় আমার কানে এলো হিমাদ্রির কণ্ঠ : সে আচমকা বলে উঠলো, 'আশ্চর্য— ভারি আশ্চর্য লাগছে তো !'

তাকিয়ে দেখলাম, হিমাদ্রি এক দৃষ্টিতে মৃতদেহের দিকে চেয়ে রয়েছে। ওর চোখের চাউনি দেখে মনে হলো, যেন কী একটি গভীর রহস্য উন্মোচন করার চেষ্টা করছে। দেখলাম, হিমাদ্রি আরো এক পা এগিয়ে গেলো সামনে, তাকালো মৃত সুধাকান্তবাবুর হাতের দিকে, তারপর খুবই অবাক হয়ে বলে উঠলো, 'এ কী !'

কি দেখে হিমাদ্রি এতো অবাক হয়েছে জিগ্যেস করতে যাচ্ছি এমন সময় বাইরে একটি ভারী জুতোর শব্দ পেলাম। একসঙ্গে সবাই তাকালাম দরজার দিকে। দেখলাম, পুলিশের একজন পদস্থ কর্মচারী এসে দাঁড়িয়েছেন। গম্ভীর ভাবে একবার আমাদের সকলের দিকে তাকিয়ে ভদ্রলোক হিমাংশুকে হাত তুলে নমস্কার করলেন, তার পরই চকিতে হিমাদ্রিকে আর আমাকে দেখে নিয়ে বলে উঠলেন, 'আপনাদের তো চিনলাম না !'

এর জবাব আমাদের দিতে হলো না। জবাব দিলেন হিমাংশুবাবু। বললেন, 'এঁরা আমার বন্ধু, ইনি হিমাদ্রি রায় আর উনি বাসব দত্ত। কাল কলকাতা থেকে এসেছেন।'

—'ও।' ভদ্রলোক আমাদের দিক থেকে চোখ ঘুরিয়ে তাকালেন সুধাকান্তের মৃতদেহের দিকে। তারপর ঘরের চারপাশ নিরীক্ষণ করে বললেন, 'কে প্রথম দেখেছিলো এই অবস্থায় ?'

অশোকবাবু জবাব দিলেন, 'সহদেব। রোজকার মতন আজও সে সকালবেলায় মামার ঘরে চা দিতে ঢুকে দেখতে পায় প্রথম। তারপর সেই আমাকে খবর দেয়।'

একটু চুপ করে কি ভাবলেন অশোকবাবু। তারপর বললেন, 'কিন্তু আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না, মামা হঠাৎ এভাবে কেন আত্মহত্যা করলেন ?'

দারোগাবাবু এবার একটু হাসলেন, 'এটা তুমি নেহাতই অবুঝের মতন কথা বললে অশোক। মানুষের মনের কথা কি বলা যায় ! কাকাবাবুর মনে হয়তো এমন কোনো দুঃখ ছিলো, যার জন্যে তিনি হঠাৎ খুব দুর্বল হয়ে পড়ে এভাবে আত্মহত্যা করেছেন।' এই বলে দারোগাবাবু একটু থামলেন।

তারপর হিমাংশুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা হিমাংশুবাবু— রাত ক'টার সময় তিনি একাজ করেছেন— আপনি কিছু আন্দাজ করতে পারছেন কি?'

হিমাংশু জবাব দিলো, 'মনে হয় রাত দুটো-তিনটের সময়।'

— 'হুঁ—' কি যেন চিন্তা করার চেষ্টা করলেন দারোগা মৃগাঙ্ক বসু, তারপর বললেন, 'রাত দুটো-তিনটের সময় ঘরে দরজা খুলে রেখে দিয়ে কাকাবাবু এই ভাবে আত্মহত্যা করেছেন— একথা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বিশ্বাস না করেও উপায় নেই।' বলে দারোগাবাবু একটি দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। তারপর বললেন, 'যাই হোক, এবার মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা দরকার।' এই বলে মৃগাঙ্কবাবু বাইরে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালেন। আমাদের কারোর মুখেই কোনো কথা নেই।

হঠাৎ সকলকে অবাক করে দিয়ে হিমাদ্রি বলে উঠলো, 'না আমার মনে হয় ডেডবডি পোষ্টমর্টেমে পাঠানো উচিত।'

আমি স্পষ্ট দেখলাম, হিমাদ্রি একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে অশোকবাবু যেন চমকে ওঠেন, 'মানে, আপনি কি মীন করতে চান? পোষ্টমর্টেম কেন?'

— 'কারণ আমার মনে হয়—' হিমাদ্রি একটু থেমে আমাদের সকলের মুখের দিকে তাকালো একে একে, তারপর আবার বললো, 'কিছু মনে করবেন-না অশোকবাবু। আমার মনে হয় সুধাকান্তবাবু আত্মহত্যা করেন নি। তাঁকে খুন করা হয়েছে।'

— 'সে কি?'— অশোকবাবু প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন। নিমেষের মধ্যে মুখখানা তাঁর ফ্যাকাশে হয়ে গেলো।

দারোগা মৃগাঙ্কবাবু গম্ভীরভাবে একবার আমার আর হিমাদ্রির মুখের দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, 'আপনার এরকম মনে হবার কারণ?'

এবার হিমাদ্রি খুব নম্রভাবে মৃগাঙ্কবাবুর দিকে এক পা এগিয়ে গিয়ে হেসে বললো, 'দেখুন, আমি পুলিশ নই অপরাধ আর অপরাধীর সম্বন্ধে কোনো ধারণাই বলতে গেলে আমার থাকবার কথা নয়। তবে আমার মনে হচ্ছে, ব্যাপারটা পরিষ্কার একটা খুনের কেস। আর এবিষয় আপনি যা বলবেন, সেটাই সত্যি মনে করবো! আমার অনুমান ভুলও হতে পারে, কিন্তু আপনার ভুল হবে না, এটা আমি জানি।'

দেখলাম, হিমাদ্রির কথায় মৃগাঙ্কবাবুর মুখের কঠিন রেখাগুলো ধীরে ধীরে সরল হয়ে গেলো। তিনি নরম গলায় বললেন, 'কিন্তু এরকম ধারণা কেন হলো আপনার, বলুন তো!'

ঘরের মধ্য সকলেই চুপ করে হিমাদ্রির মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে। একটু চুপ করে থেকে সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে হিমাদ্রি বললো, 'কাল বিকেলে পলাশপুরে পা দিয়েই আমরা সুধাকান্তবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। তখন তিনি নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনা করেছিলেন, অবশ্য বেশির ভাগ কথা বলেছিলেন তাঁর হাসপাতাল নিয়ে। আর আমরা যখন বিদায় নিই, তখন তিনি আমাদের নিমন্ত্রণ করেছিলেন— বলেছিলেন আজ সকালে আমরা যেন এখানে এসে তাঁর সঙ্গে চা খাই। এথেকে বোঝা যায় তিনি আত্মহত্যা করেন নি বা আত্মহত্যা করবার কোনো পরিকল্পনাই তাঁর মনে ছিলো না। থাকলে কখনোই এভাবে সকালে আসতে বলতেন না।'

এবার হিমাদ্রিকে বাধা দিলেন মৃগাঙ্কবাবু, বললেন, 'এইটাই কি আত্মহত্যার বিরুদ্ধে বড়ো প্রমাণ হলো?— আমি এমন একটা সম্ভ্রান্ত ধনী লোককে জানি— যিনি সন্ধ্যাবেলায় সিনেমার টিকিট কেটে দুপুরবেলায় আত্মহত্যা করেছিলেন।' বলে তিনি একবার অশোকবাবুর দিকে তাকালেন। কিন্তু অশোকবাবু কোনো কথা বললেন না।

হিমাদ্রি বললো, 'না এটা কোনো প্রমাণই নয়। আসল প্রমাণ অন্য। আপনি লক্ষ্য করলে দেখতে পাবেন, সুধাকান্তবাবুর বেড-সিটটা গাঢ় সবুজ রঙের। আর তাঁর দুই হাতের মুঠির মধ্যে থেকেও ঐ রঙেরই সুতো বেরিয়ে রয়েছে। এ থেকে কি বোঝা যায়? বোঝা যায়, তিনি মৃত্যুর আগে দু'হাত দিয়ে বিছানার চাদরটা আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করেছিলেন অর্থাৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিলো— সেই জন্যে আর কোনো অবলম্বন না পেয়ে তিনি বিছানার চাদরটাকেই আঁকড়ে ধরে অবলম্বন খুঁজছিলেন।' এই বলে একটু থামলো হিমাদ্রি, বোধ হয় মনে মনে কথা সাজাবার জন্যে। তারপর আবার বলতে শুরু করলো, 'তা ছাড়া দেখুন— যে মানুষ নিজের হাতে গলায় দড়ি দেবে তার হাতে নিশ্চয়ই বিছানার চাদরের সুতো লেগে থাকার কথা নয়।' এবার হিমাদ্রি একটু থেমে মৃগাঙ্কবাবুকে জিগ্যেস করলো, 'এ বিষয়ে আপনার কি মতামত বলুন, শুনি।'

মৃগাঙ্কবাবু জবাব দিলেন, 'সেটা পরে বলছি, তার আগে বলুন খুনের আর কি প্রমাণ আপনি পেয়েছেন!'

(ক্রমশঃ)

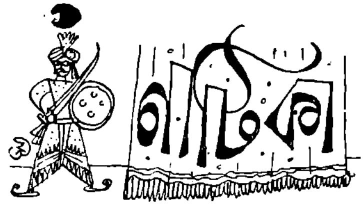

পাষাণপুরীর রাজকন্যে

বষ্ঠিবুড়ি

প্রথম দৃশ্য

[পর্দা উঠলে দেখা যাবে এক রাজার ছেলে সুকোমল শয্যায় গভীর ঘুমে অচেতন। একটু পরে পা টিপে টিপে এক বুলবুলি পাখি ঢুকলো ঘরে। রাজার ছেলের বিছানার কাছে এসে দাঁড়ালো সে। একটু ঝুঁকে পড়ে ভালো করে দেখলো রাজার ছেলে সত্যিই ঘুমোচ্ছে কিনা। তারপর হাত নেড়ে হাওয়া করার ভঙ্গিতে বলতে লাগলো :]

বুলবুলি। অচিন দেশের রাজার কুমার ঘুমাও কতো আর
স্বপনভরা নয়ন দু'টি মেলো একবার।
ফুলকুমারী জাগলো বনে আকাশ হলো ভোর
রাজার কুমার, কাটবে নাকি তোমার ঘুমের ঘোর ?

রাজপুত্র। (চোখ মেলে) কে জাগালে আমায় ? কে তুমি ?

বুলবুলি। আমি বুলবুলি চুলবুলি শিস দিয়ে যাই,
ঘুমে ভরা চোখ পেলে চুম দিয়ে ভাই,
ঘুম ভাঙানিয়া গান গেয়ে যাই।

রাজপুত্র। একরত্তি বুলবুলি পাখি! আমার কাছে তুমি কি চাও?

বুলবুলি। কিছু চাই না। শুধু তোমাকে আমার একটা গান শোনাতে চাই।

রাজপুত্র। (দু'হাতে চোখ কচলে) বাঃ বেশ তো। বুলবুলি শিস দিয়ে আমার ঘুম ভাঙালো, এখন আবার গান শোনাতে চায়!

বুলবুলি। তোমার চোখের ঘুম গেছে তো ?

রাজপুত্র। ক-খো-ন গেছে!

বুলবুলি। তাহলে মন দিয়ে আমার গানটা শোনো। জানো রাজকুমার, এই গান দেশে দেশে সবাইকে শুনিয়ে বেড়াবো বলে নিজের দেশ ছেড়ে বেরিয়েছি আমি। এ গানে আকাশ কাঁদে, বাতাস কাঁদে,

সাগর কাঁদে, ঝরনা কাঁদে। বনের পশুপাখির চোখের জল বাঁধ মানে না। এ গান শুনে তোমার মন কি গলবে না, রাজকুমার ?

রাজপুত্র। গান শুনতে আমি খুব ভালোবাসি। শোনাও তোমার গান।

বুলবুলি। শোনো তবে :

ঘুমনগরের প্রাসাদপুরী নীল পাহাড়ের কোলে
রাজার মেয়ে নাইতো সেথা দুধসাগরের জলে।
রাজার মেয়ে চম্পালিকা
রূপের বরণ অগ্নিশিখা।
চাঁদের কণা ঝিলিক হানে হরিণ কালো নয়নে।
চিকুন দিতে কাঠবিড়ালী তার
ছিলো দিতে বুলবুলি আর।
(তারা) পদ্মমধু আনতে গেল পদ্মঝিলের বনে॥
হায় গো, তখন কি যে হলো কারো তো নাই জানা।
রক্ষপুরের দত্যি এসে রাজ্যে দিলো হানা।
মন্ত্রী রাজা হলেন হত
মলেন বীর যোদ্ধা যত।
কেউ আঁটেনা মহাবলী দত্যি রাজা-সনে॥
তিন পাষাণের দেয়াল জোড়া
পাষাণপুরী রুদ্ধকারা।
বন্দী হলো রাজার মেয়ে তারি মধ্যখানে॥

রাজপুত্র। তারপর ? তারপর ?

বুলবুলি। তারপর আর কী! বন্দী হয়ে রইলেন রাজার মেয়ে সেই তিন পাষাণের দেওয়ালের মধ্যে। কেমন করে যে সেখানে তাঁর দিন কাটছে, কেউ জানে না। একটা মাছিও সেখানে ঢুকতে পায় না। চারিদিকে এতোই কড়া পাহারা।

রাজপুত্র। সেই দেয়াল ভেঙে রাজকন্যাকে উদ্ধার করতে পারে না কেউ ?

বুলবুলি। তাকেই তো খুঁজতে বেরিয়েছিলাম গো! পথে আসতে আসতে খবর পেলুম সোনালী ঝরনার নীলকণ্ঠ পাখি আর মেঘ-সায়রের শুক্তির মুখে যে, অচিন দেশের রাজর ছেলে মস্ত বীর। তার মতো যোদ্ধা নাকি কোথাও নেই।

রাজপুত্র। আমার কথা বলছো ?

বুলবুলি। হ্যাঁ গো রাজপুত্র, তোমার কথাই বলছি। (কাছে এসে হাত ধরে)
ভাবছো কি ভাই, অমন করে দু'টি নয়ন মেলে?
ঘুম নগরের আঁধার ঘরে দাও গো প্রদীপ জ্বেলে।
সে দেশে আজ কাঁচা-খেগো গ্রহের ফেরে রাজা—
রাজার কুমার, তোমার হাতে হবে না তার সাজা?

রাজপুত্র। ঠিক ঠিক। দৈত্য বেটার উচিত শাস্তি হওয়া দরকার। (উঠে দাঁড়ালো) চলো ভাই বুলবুলি, এক্ষুণি বেরিয়ে পড়ি।

বুলবুলি। (পরমোৎসাহে) চলো। কিন্তু এইভাবে যাবে? তোমার যুদ্ধের পোশাক কই? তরবারি কই? পক্ষীরাজ ঘোড়া কই।

রাজপুত্র। সব আছে। তুমি এসো না আমার সঙ্গে। দেখো, এক্ষুণি তৈরি হয়ে নিচ্ছি আমি। (উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

[পাষাণ কারার অন্তরালে একটা ঘরে বন্দিনী হয়ে আছে ঘুমনগরের রাজকন্যা চম্পালিকা। পর্দা উঠলে দেখা যাবে ঘরে একটা পিলসুজের উপর ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে আর তার সামনে মেঝের ওপর বসে আছে রাজকন্যা]

রাজকন্যা। আর তো পারি না এমন অন্ধকারে দিন কাটাতে। কেন দৈত্য আমায় বন্দী করে রেখেছে? সে আমায় মেরে ফেলে না কেন!
(কাঁদতে লাগলো)

(এমন সময় বাইরে একটা কাঠবিড়ালীর ডাক শোনা গেলো)

কাঠবিড়ালী। চিক চিক চিক
দিক পেয়েছি ঠিক।
রাজকন্যে নিশি জেগে আছেন
একেলা বসে কাঁদেন।

রাজকন্যা। (চমকে উঠে) কে রে— কে?

কাঠবিড়ালী। আমি গো— তোমার চিকুন মিতে। (কাঠবিড়ালীর প্রবেশ)

রাজকন্যা। চিকুন মিতে কাঠবিড়ালী!
কি করে তুই হেথায় এলি?
কে পাঠালে তোকে?

কাঠবিড়ালী। সকাল বেলায় গাছের থেকে
চন্দনা যে বললো ডেকে

রাজকন্যে খায় নি কিছু উপোস করে আছে।
দৈত্যি নাকি হুকুম দেছে
মাংস কাঁচা খেতে হবে?
শিখতে হবে আদব-কায়দা দৈত্যি-দানার কাছে?

রাজকন্যা। হ্যাঁরে মিতে, আমিও তাই শুনেছি। আজ রাক্ষুসী অমানিশে একথালা কি সব বিচ্ছিরি কাঁচা মাংস এনে খেতে দিয়েছিলো। আমি খেতে পারি নি। ফেলে দিয়েছি।

কাঠবিড়ালী। বেশ করেছো। আবার অমনি খাবার নিয়ে এলে
দিয়ে দিও রাক্ষসীটার দুটো কানে ঢেলে।
পেস্তা বাদাম চাই কি তোমার?
এনেছি তার গোটা দু'চার।

(একমুঠো বাদাম রাজকন্যের সামনে মেঝের ওপর রেখে দিলো কাঠবিড়ালী। রাজকন্যে বাদামগুলো তুলে নিয়ে একটা নিশ্বাস ফেলে বললো:)

রাজকন্যা। তুই সত্যি আমার মিতা। এমন করে আমার কথা কেউ তো আর ভাবে না। হ্যাঁরে চিকুন মিতে, আমার বুলবুলি মিতা কেমন আছে রে? কতোদিন যে তাকে দেখি না।

কাঠবিড়ালী। সেই কথাই বলতে হেথায় আমার আসা।
বুলবুলি সেই মিতা তোমার বুদ্ধি রাখে খাসা।

রাজকন্যা। কেন? কি করেছে সে?

কাঠবিড়ালী। তোমার তরে আনতে গেছে দেশের সেরা বীর
শক্তিতে যে প্রচণ্ড আর বুদ্ধিখানায় ধীর।
সেই বীরেরই কৌশলে হবে দৈত্য হত
নয় তো রবে শৃঙ্খলেতে বন্দী পদানত।
নিশ্চিত তার হবে এবার মরণ পরাজয়।
রাজকন্যে দুঃখ করো না আর রেখো না ভয়।

রাজকন্যা। চিকুন মিতে তোকে কি দেবো? এতো বড়ো একটা সুখবর দিলি আমাকে! এই নে রত্নহার— এই তোর পুরস্কার।

(রাজকন্যা খুশি হয়ে নিজের গলা থেকে একছড়া হার খুলে দিলো কাঠবিড়ালীকে। সে সেটা গলায় পরে নাচতে লাগলো মনের আনন্দে)

কাঠবিড়ালী। বাহবা বাহবা কেয়াবাৎ ক্যা মজা। রাজকন্যে হার দিয়েছেন, গিন্নি দেবে আতাফলের কুচো গজা। ক্যা মজা।

(নাচতে নাচতে প্রস্থান। রাজকন্যা হাসিমুখে তাকিয়ে রইলো তার দিকে। ধীরে ধীরে পর্দা নেমে এলো।)

তৃতীয় দৃশ্য

[দৈত্যরাজার রাজসভা। সিংহাসনে দৈত্যরাজ বসে আছেন একা। তাঁর সামনে সভাসদদের আসনগুলো সব খালি পড়ে আছে। এমন সময় তিনটি রাক্ষসী ভীত ত্রস্ত ভঙ্গিতে ছুটে এলো রাজসভার মধ্যে]

১মা। ওগো রাজা খবর শুনেছো? কী যে সর্বনাশ হলো।

২য়া। সবাই এবার ধনে-প্রাণে মলো।

৩য়া। কেউ রবে না জ্যান্ত আর ঘুমনগরের দেশে।
অলক্ষুণে এসেছে এক হাওয়ায় ভেসে ভেসে।

দৈত্য। কী গোলমাল করিস তোরা চুপ করে সব দাঁড়া।

১মা। পিছন থেকে করছে তাড়া দাঁড়াই কোথা হায়!

২য়া। রাজা তোমার সুখের রাজ্যি এবার বুঝি যায়।

দৈত্য। (রেগে মেগে) হতচ্ছাড়ি শাকচুন্নিরা একধারসে পড়বি মারা
ফের যদি ঐ বাক্যি বলিস দৈত্য রাজার কাছে।
আমার রাজ্য কেড়ে নিতে কার ক্ষমতা আছে?

৩য়া। (কাঁপতে কাঁপতে) রাগ করো না রাজামশাই, খবর শোনো সত্যি,
রাজ্যে তোমার এসেছে এক দত্যি মারা দত্যি।

১মা। (হাত মুখ নেড়ে) শন শন তার তরবারি এদিক ওদিক ঘোরে—
পথের পরে দত্যিগুলোর মুণ্ডু কেটে পড়ে।

দৈত্য। প্রহরীরা আছে আমার নগর রক্ষা করে
অত্যাচারী শত্রুটাকে আনবে তারা ধরে।

২য়া। (কপাল চাপড়ে) হায় গো রাজা, কেউ বেঁচে নেই।
তরবারির চোটে
ধড়গুলো সব ধড়ফড়িয়ে
পথের পড়ে লোটে।

দৈত্য। (ভয় পেয়ে) ধুস। দেখতে কেমন শত্রুটাকে?
চিন কি অচিন?
একটা ধ'ড়ে কটা মুণ্ডু? আছে ক'টা শিং?

১মা। দেখার কি হায় অবকাশ আর রেখেছে সে কারো?
এবার তুমি প্রাণরক্ষার উপায় রাজা করো।
সে এসেছে রাজকন্যে চম্পালিকার তরে,
যুদ্ধ দেবে তোমার সনে, ডাকছে পথের 'পরে।
শোনো রাজা শোনো। (কোলাহল নিকটবর্তী)

৩য়া। প্রাণ বাঁচা বোন, পালা এখান থেকে
আসছে সেটা বিষম স্বরে হেঁকে। (সবেগে রাক্ষসীদের পলায়ন)

দৈত্য। দাঁড়া তোরা আসছি আমি ঢাল তলোয়ার নিয়ে,
কেউ যেন আর যায় না হোথা পথের উপর দিয়ে।
কে এসেছে মরতে দেখি যম ডেকেছে কাকে।
আমি সামনে দাঁড়ালে আর কে রাখিবে তাকে।

(সিংহাসনের পাশ থেকে ঢাল আর তলোয়ার তুলে নিয়ে দৈত্যরাজা ছুটে বেরিয়ে গেলো রাজসভা থেকে। একটু পরেই আমাদের রাজপুত্র রক্তাক্ত, মুক্ত তরবারি হাতে বেগে ঢুকে ছুটে গেলো দৈত্যের পেছনে)

রাজপুত্র। কোথায় পালাবে তুমি শয়তান ?

(কিছুক্ষণ পরে ভিতর থেকে দৈত্যের মরণাহত আর্তনাদ শোনা গেলো। তারপর সব চুপ। একটু পরে বুলবুলি আর কাঠবিড়ালী মঞ্চে এসে ঢুকলো। হাততালি দিয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে নাচতে তারা গাইতে লাগলো—)

বুলবুলি ও কাঠবিড়ালী। কী মজা ভাই কী মজা !
রাজকুমারের হাতে মলো বিষম দত্যি রাজা
বাজা তোরা বাদ্যি বাজা, বাদ্যি বাজা।
রাজার ছেলে রাজার মেয়ে
দু'জনাতে দেবো বিয়ে।
থাকবো সুখে নিজের দেশে খাবো খাস্তা গজা !
বাজা তোরা বাদ্যি বাজা, বাদ্যি বাজা॥

(ওদের নাচগানের মাঝখানে রাজকন্যার হাত ধরে রাজপুত্র মঞ্চে এসে দাঁড়াবে। ভিতর থেকে শাঁখ বাজবে, শোনা যাবে হুলুধ্বনি। ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসবে)

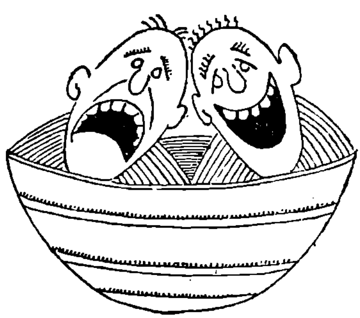

শীত

রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়

হিমালয়ের চুড়োয় থাকি, শীত যে আমার নাম—
বছর বছর বেরিয়ে পড়ি দেখতে ধরাধাম।
জাঁকজমকের বাহার একটুও নেই আমার
বিনা ভাড়ার সওয়ার আমি, যেথায় খুশি তাই
খেয়াল-খুশি-মর্জিমত আপনি চলে যাই।

আমায় দেখে ধরার সবাই ভয়েই জড়োসড়ো,
গাছের পাতা ঝরে পরে, নদী তো মরো-মরো
দক্ষিণ-পথ ধরে সূর্য যে যায় সরে
আকাশ লুকোয় কুয়াশা তলে, হাওয়ায় হিম ভরা
মুসড়ে পড়ে, চুপসে যায়, কুঁকড়ে থাকে ধরা

আমি তো ভাই পাইনে কূল অথৈ ভাবনা-ড়লে
এড়িয়ে যেতে চায় কেন আমায় প্রাণীদলে।
দোয়েল-কোকিল-স্বর আমার প্রাণের 'পর
ঢালে না সুধা; সাজায় না পথ বনের মঞ্জরী—
তাইতো আমি একাই ফিরি বৈরাগী বেশ ধরি!

রিক্ত-ভূষণ দীনের মত আমি যে ফিরি ফের—
সরিয়ে দিয়ে সকল বাধা আগত বসন্তের।
দুঃখ শুধু মনে কেউ কোন না ক্ষণে
আমার পানে তাকায় ফিরে মুগ্ধ নয়ন মেলে
ভাবে না কেউ আমার কাছে কি ধন তারা পেলে।

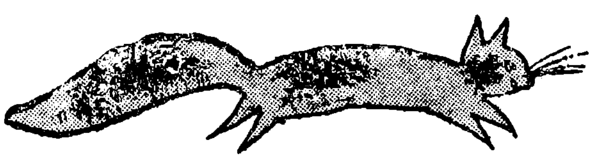

বিদেশী সাহিত্য

গোয়েন্দা-গল্পের মেড-ঈজি

শ্রীহর্ষ মল্লিক

ডিটেকটিভ গল্প লিখতে হবে একটা।

প্রকাশক তো বার বার আমায় তাগাদা দেন ডিটেকটিভ গল্প লেখার জন্য। কিছু না হোক দিনে নাকি হাজার কপি বিক্রি হয় ডিটেকটিভ বই, যখন তখন — এক ঘণ্টাতেই।

খুন-খারাপি গল্প, কে না পড়ে। ছেলে বুড়ো সবাই এর খদ্দের।

তবে এতো যে ডিটেকটিভ বই বিক্রি হয় তার কারণ আছে। তার কারণটা হলো, ডিটেকটিভ নিজে সব সময়ই মুখ-গম্ভীর, কিন্তু ঠিক হামাগুড়ি দিয়ে সূত্র খুঁজে বেড়াচ্ছেন! সপ্তায় হয়তো একটা মাত্র কথা বললেন, কেউ কেউ অবশ্য মাসে একটা কথাও বলেন। তারপর তিনদিন ধরে ক্রমাগত শুয়ে শুয়ে সিগারেটের ধোঁয়ায় মগজ সাফ হলে, তখন ডিটেকটিভ বলেন তাঁর সহকারীকে, 'কেল্লা মার দিয়া।' আর বোকা বোকা চোখে তাকায় সহকারী: 'ব্যাপার কী পণ্ডিত?'

তার পরেও বাকি থাকে।

খুনীকে ধরতে হবে কিম্বা চোরাই মালটি উদ্ধার করতে হবে। তাকে ফাঁসিকাঠে ঝোলাতে হবে, কিম্বা চালান করতে হবে আন্দামানে। শেষকালে গ্র্যাণ্ড হোটেলের একটা পার্টিতে তিনি সমস্ত রহস্য ভেদ করবেন।

আর এ সব ফর্মুলা জানা থাকলে গোয়েন্দা গল্প লেখা কী আর এমন শক্ত ব্যাপার? একবার আরম্ভ করলেই তো হলো!

হ্যাঁ, ডিটেকটিভ গল্পের আরম্ভটাই তো আসল। প্রথমেই কেউ মারা না গেলে তো গল্পটাই মারা যাবে! সেইখানেই যদি গলদ রয়ে গেলো তো গোটা গল্পটাই জমাটির বদলে মাটি! কি লেখকের আর কি পাঠকের!

তাই নিয়ম হলো, একটা জমাটি খুন দিয়ে গল্পটা আরম্ভ করা—

"শনিবারের দুপুর। অফিসে একা বসে আছেন মিঃ ত্রিলোচন শর্মা। আজকের কাজকর্ম শেষ হয়ে গেছে সব। বাবুরা সবাই চলে গেছেন। নিচের তলায় যে দারোয়ান থাকে, সে ছাড়া আর কেউ নেই সেই অফিস-বাড়িতে।

টেবিলের 'পরে ঝুঁকে বসে তিনি পড়ছিলেন সেদিনকার কাগজটা। হাতটা তাঁর চিবুকের নিচে, চোখ দু'টিও আধ-বোজা।"

ব্যস এই তো হয়ে গেলো।

পাঠক এবার ভাবুক, বসে বসে কী ভাবছেন ঐ ত্রিলোচন শর্মা নির্জন দুপুরে অফিস-ছুটি হয়ে যাবার পরেও! কিন্তু তারা গোয়েন্দা গল্পের অন্ধি-সন্ধি জানে। তারা ঠিকই ধরে ফেলবে, এইবারে হবে খুনটা।

...প্রথম পাতায় তো এইভাবে শুরু করা হলো ত্রিলোচন শর্মার নাম দিয়ে। কিন্তু পরের পাতাতেই বলা হবে 'দেহ', তখন আর নাম-টাম নয়। কেউ কেউ আবার এর পরে দেহটির একটা সংক্ষিপ্ত বর্ণনাও দিয়ে দেন।

"দেহটি মাঝ বয়সী এক ভদ্রলোকের। পরিচ্ছন্ন ছিম্‌ছাম বেশ-বাস এবং সম্ভ্রান্ত চেহারা।"

এর পরেই আরম্ভ হবে দ্বিতীয় অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ের চেয়ে বেশি কিছু বলা হবে না। বললে তো হয়েই গেলো। তাহলে ডিটেকটিভ আর করবেন কি! ডিটেকটিভ গল্পে যতো কম কথা বলা হবে ততোই মঙ্গল।

অবিশ্যি, ঠিক এভাবেই যে গল্প শুরু করতে হবে, তেমন বাঁধা-ধরা কোনো নিয়ম নেই।

প্রথম পাতাতেই পাঠকের মনে একটা কৌতূহল আর ভয়-ভয় ভাব জাগিয়ে দেওয়া যেতে পারে একটা বয়স্ক লোককে খুন করিয়ে কোনো নির্জন স্থানের বাগান-বাড়িতে— কিম্বা ঐ ধরণের কোনো পরিস্থিতিতে। বেশির ভাগ পাঠক কিন্তু এই ধরণের গল্পই পছন্দ করেন। গল্পটি নাকি তাতে বেশি জমাটি হয়—

"রায়বাহাদুর বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহ বসেছিলেন তাঁর লাইব্রেরি ঘরে। কনকনে শীতের রাত্রি। চারিদিক নির্জন। জানলা দরজার ভারি ভারি পর্দাগুলো নড়ছে না এতোটুকু। বাইরের কোনো শব্দ আসছে না এ-ঘরে।

একমাত্র পরিচারিকা, সে থাকে একতলার সর্বদক্ষিণ ঘরে। আর এক দারোয়ান— সিঁড়ির ঠিক নিচেই।

জনপ্রাণী বলতে এই দু'জন ছাড়া আর কেউ নেই। বছরের এ সময়টা সবাই যে যার ছুটি নিয়ে বাড়ি চলে যায় পৌষ-পার্বণের মেলায়।

একটা মূল্যবান ডেক চেয়ারে তিনি আধাশোয়া অবস্থায় ছিলেন। তাঁর মাথাটা ছিলো সামনের দিকে ঝুঁকে— প্রায় চিবুক পর্যন্ত নেমে এসেছে। তিনি কি করছিলেন তা বোঝা গেলো না ভালো করে।"

এই যে আরম্ভ করলাম, এমন একটি পাঠক তো নেই যে বুঝবে না এর অন্তর্নিহিত অর্থ কি !

একটা নির্জন গ্রাম-প্রান্তের বাড়িতে একটা বয়স্ক লোকের একাকী বসে থাকার কোনো মানে হয় ? তাও, যে বাড়িতে পরিচারিকা আর দারোয়ান ছাড়া আর কোনো লোক নেই। এ তো স্পষ্টই বোঝা যায় যে, লোকটি ঠাণ্ডা মাথায় খুন হবার জন্যেই বসে আছে।

তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে, যারা খুন হচ্ছে, তারা শতকরা নিরানব্বই ভাগ হলো 'মাঝবয়সী ভদ্রলোক' ! কেন, এ ছাড়া কি আর কাউকে দিয়ে গল্প চলতে পারে না ? কোনো স্ত্রীলোক কি শিশুকে দিয়ে ? উঁহু ! তাহলেই সব মাটি। তার সঙ্গে তো কারোরই কোনো সম্পর্ক নেই। স্ত্রীলোক তো আরো লজ্জার ব্যাপার।

এইভাবে শুরু করে দিয়ে তারপর একে একে মৃতদেহ আবিষ্কার, ইন্সপেক্টরের আগমন অবশেষে পরিচারিকা বা দারোয়ানকে গ্রেপ্তার।

তবে ঘুঘু পাঠক তো এটা আগেই আন্দাজ করে নেবে, যখনই বলা হয়েছে "বাড়িতে একটি পরিচারিকা আর দারোয়ান ভিন্ন থাকে না কেউ"— তখনই বুঝবে, ওরা তো তখনই গ্রেপ্তার হলো বলে ! তারাই যে খুনী তা নয়, তবে সন্দেহভাজন ব্যক্তি তো— যাদের না হলে কোনো জমাটি গোয়েন্দা গল্পই তৈরি হয় না।

কিন্তু শুধু এ দু'জন ছাড়া গল্পে আর কেউ যদি না থাকে— তো গল্প পটল তুলবে। অন্ততঃ আর একটা লোককে থাকতে হবেই !

আর তিনিই হলেন— না, ঠিক নায়ক নন, আধা নায়ক। কারণ গোয়েন্দা গল্পে গোয়েন্দামশাই নিজেই নায়ক। বাকি সবাই 'সাইড পার্ট।'

এ হলো সেই লোক। যে কিনা নিহত ব্যক্তির সম্পত্তির উত্তরাধিকারী কিম্বা তার সঙ্গে ঐ নিহত ব্যক্তির পূর্বে কোনো কলহ হয়ে গেছে— অথবা দুর্ঘটনার দিন সবচেয়ে শেষে সেই-ই বেরিয়েছিলো বাড়ি থেকে।

এ লোকটিকেও গ্রেপ্তার করেন অনেকে। তবে না করলেও চলে বোধহয়।

এইসব গ্রেপ্তার-টেপ্তার ইত্যাদি কাজ কিন্তু স্থানীয় দারোগাই করবেন। ডিটেকটিভ তখনো পর্যন্ত গল্পে অনুপস্থিত।

মৃতদেহটা আবিষ্কার হবার পরে দারোগারা 'অকুস্থলে' আসেন। তিনি এসে মুখ গম্ভীর করে ধমক-ধামক দিয়ে সকলের কাছ থেকে জবানবন্দী আদায় করবেন। অনেকেই অনেক কথা দারোগার কাছে চেপে যাবে। তারপর

তিনি মুখটা গম্ভীরতর করে বলবেন— 'বড্ড জটিল কেসটা!' শেষকালে মুখটা গম্ভীরতম করে ঐ গ্রেপ্তার-ট্রেপ্তার ইত্যাদি···

এইবারে গল্পটা জমলো বেশ। কিন্তু মুস্কিলের শুরু হলো এইখান থেকেই। গল্প বলবে কে?

অর্থাৎ ডিটেকটিভ, না লেখক্ নিজেই? কারণ এটা তো বোঝা যাচ্ছে যে, ডিটেকটিভমশাই এসে গেলেন বলে গল্পের মধ্যে! হয় তিনি ঐ খুন হওয়ার কাছাকাছি কোনো জায়গায় বেড়াতে এসেছেন, তারপর গন্ধ পেয়েই চলে আসবেন অকুস্থানে। না হয়, ঐ বাড়ির কারোর সঙ্গে জানাশোনা থাকে ডিটেকটিভদের। তারাই 'কল্ দেয়' তাঁকে। আবার কখনো দেখা যায় যে স্থানীয় দারোগার সঙ্গেও আলাপ থাকে ডিটেকটিভদের।

সে যাই হোক না কেন, লেখক যদি নিজেই বর্ণনা করে যান কাহিনীটা, তবে তো ডিটেকটিভের গুরুত্ব কমে যায় অনেকটা। কারণ লেখক তো আর কোনো চরিত্রকে বেশি আস্কারা দিতে পারেন না। কিম্বা ডিটেকটিভ যদি নিজেই বলে যান গল্পটা, তাহলে তিনি তো পাঠকের চোখে খেলো হয়ে যাবেন! তাঁর 'তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পরিচয় তিনি তো আর নিজের মুখে জাহির করতে পারেন না! এ এক মহা সমস্যা!

তাই তখন আমদানী করতে হয় একটা 'ফাউ'— মানে, একটা সহকারীর। সেই-ই বর্ণনা করে যাবে গল্পটা। স্বভাবতই তাকে একটু বোকা হতেই হবে। সে না বোকা হলে ডিটেকটিভের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিটা পাঠক বুঝবে কি করে! সহকারীর কাজই হবে শুধু বোকা বোকা প্রশ্ন করা আর কথায় কথায় ডিটেকটিভের সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রশংসা করা।

এই সহকারীটি আর দারোগাটির মগজের মাপ হবে প্রায় একই ধরণের— একটু উনিশ-বিশ। দু'জনেই ভুলপথে যাবে। কিন্তু ডিটেকটিভমশাই মাঝে মাঝে 'অর্থপূর্ণ' হাসি হাসবেন।

দেখি, আমাদের ডিটেকটিভ মশাই কি করলেন এতোক্ষণে—

'কিন্তু', আমি সঙ্কোচ করি— 'কেমন করে তুমি বললে যে হত্যাকারীর পায়ে ছিলো রবারের জুতো?'

আমার বন্ধুটি কিন্তু রহস্যময় হাসি হাসলেন শুধু।

'তুমি তো দেখেছো,' বললেন ডিটেকটিভ, 'ঘরের দরজার ঠিক সামনেই, দশ বর্গফুট জায়গায় (ইতিমধ্যে সেটা মেপে নিয়েছেন তিনি) ধুলো ভরা।

এবার দেখো, তার ওপরের পায়ের ছাপগুলো। পরিষ্কার, টাটকা ছাপ। একেবারে রবারের জুতো ছাড়া আর কোনো জুতোর এমন সুন্দর ছাপ পড়ে?

এবার আমি দেখলাম, হ্যাঁ প্রায় ডজনখানেক পায়ের ছাপ ফুটে রয়েছে ঘর আলো করে।

আমি লজ্জিতভাবে বলি, 'কিন্তু তুমি কি করে হত্যাকারীর পায়ের ছাপটা চিনতে পারলে? এটা তো অন্তত বলে দেবে আমাকে?'

আমার ডিটেকটিভ বন্ধুটি হাসলেন আমার দিকে চেয়ে— ঠিক তেমনই 'রহস্যময় হাসি।'

'রবারের জুতোর ছাপটা মেপে।' দ্রুত জবাব দেন ডিটেকটিভমশাই, 'তার থেকে রবারের পুরুত্বটা বাদ দিয়ে দুই দিয়ে গুণ করে—'

চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো আমার— 'দুই দিয়ে গুণ করে কেন?'

'পায়ের পাতা আর গোড়ালির জন্য!'

কি সূক্ষ্ম হিসাব, একেবারে অঙ্কের মতো অথচ এই সহজ হিসাবটাই এতোক্ষণ ঢুকছিলো না মাথায়।

অর্থাৎ, এই সহকারীই হলো আসলে পাঠকদেরই গোত্রের— বোকাস্য বোকা। না হলে ডিটেকটিভের মহিমাই বা খুলবে কি করে?

অগত্যা তাই— দারোগাকে এই 'জটিল কেস' নিয়ে হিমসিম খেতে হয়। ডিটেকটিভমশাইকে কথায় কথায় 'রহস্যময় হাসি' হাসতে হয় আর কাগজ-ওয়ালারা প্রতিদিন এখনও 'সমান অন্ধকারে' বা 'গভীর রহস্যাবৃত' ইত্যাদি কথা ছাপতে পারলে বেঁচে যায়।

কিন্তু ডিটেকটিভের পার্সোন্যালিটি যাতে ফুটে বেরোয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে। যেমন ধরা যাক, খুব মোটা সোটা চেহারার ডিটেকটিভ হলে চলবে না, তার বুদ্ধিও হবে (তেমন মোটা ধরণের! অন্তত তেমনই তো বলেন একালের রহস্যভেদীরা) মোটমাট তাদের দেখতে হবে রোগা পাতলা। যেমন কিরীটী রায় কি ব্যোমকেশ বক্সীর মতো। বিশেষজ্ঞদের মতে তাদেরই নাকি ডিটেকটিভসুলভ 'সূক্ষ্ম বুদ্ধি' থাকে। কারণ প্রথমেই যদি তাঁর চেহারা পাঠকের মনে না ধরে, তো মুস্কিল ডিটেকটিভেরই।

তাঁর দৃষ্টি হবে তীক্ষ্ণ, হাসি রহস্যময়, হাঁটা গানিতিক নিয়মে, কথা 'স্পিকটি নট' কিম্বা ঘণ্টায় একটা—! তাঁকে দেখতে হবে খুব সাধারণ, কিন্তু চোখে পড়বার মতন। মুখের ভাব তাঁর বদলায় না কখনোই— যতোই কাণ্ড ঘটুক না কেন বাইরে বা আশেপাশে!

একটা কিছু নেশা তাঁর থাকতেই হবে— হয় সিগারেট, নয় চুরুট— তবে চুরুট চলে বেশি আজকাল। নস্যি-টস্যিও নেন বটে অনেকে, তবে নাম করতে পারেন না। অনেকে আবার দাবা খেলতে খেলতে বা কবিতা লিখতে লিখতেও আবিষ্কার করেন হত্যাকারীকে।

তবে ঐ সব নিয়ম-কানুন প্রায়ই পালটে যাচ্ছে আজকাল। কোনো কোনো ডিটেকটিভ আবার রীতিমতো ভোজনবিলাসী ইত্যাদি···

দেখি, আমাদের ডিটেকটিভমশাইয়ের কি গতি হলো?

'এক মিনিট দাঁড়াও।'

আমাকে আর দারোগাবাবুকে থামিয়ে দিলেন ডিটেকটিভ। দারোগা মশাই তো হঠাৎ এই আদেশ শুনেই থতমত খেয়ে গেলেন! কিন্তু না, তেমন কিছু বললেন না ডিটেকটিভ। 'প্রায় আধ ঘণ্টা আগে নেমেছি আমরা ট্রেন থেকে। কিছু খাওয়া যাক। আসবার সময়ে ষ্টেশনের ধারেই দেখে এসেছি বেশ বড়ো একটা রেস্তোরাঁ। সেটাতেই চলো—'

রেস্তোরাঁর নাম 'ভোজনিকা'।

এমনতরো নাম কখনো শুনিনি আমি। কিন্তু ডিটেকটিভ বুঝিয়ে দিলেন আমাকে— 'এর মালিক নিশ্চয়ই একজন বাংলার মাষ্টার। নাম শুনে বুঝতে পারছো না? কিম্বা কোনো কবি-টবি বোধহয়।'

'তিন প্লেট ডিমের খিচুড়ি তিন ফোঁটা জারক দিয়ে— মাংসের মামলেট কোয়ার্টার প্লেট করে।'

মাংসের মামলেট? হয় নাকি? তা জানিনে আমি। কিন্তু ডিটেকটিভ যখন অর্ডার দিয়েছেন বেশ গম্ভীরভাবেই, তখন হয় নিশ্চয়ই। তাছাড়া খাদ্যরসিক বলে তাঁর নামও আছে। শুধু তাই নয়। বিশ্বের যাবতীয় তথ্য যেন তাঁর নখদর্পণে। কনষ্ট্যান্টিনোপল নিয়ে কথা হচ্ছিলো। ডিটেকটিভ যেন কেমন করে শুনে ফেললেন। আমি বললাম, 'কনষ্ট্যান্টিনোপল চেনো?'

'চিনবো না? কবে থেকে চিনি বলতে গেলে। খুব ভালো লোক— খুব ভালো—' বাকিটা কানে গেলো না আমার! আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলাম!

ডিটেকটিভের পার্সোন্যালিটি তো গেলো। এইবার ঢুকতে হবে তদন্তের মধ্যে। ডিটেকটিভের তদন্তের সময়ে সর্বদা তাঁর বোকা সহকারীটি ঘুরবে পায়ে পায়ে। অবশ্য এই তদন্তের পদ্ধতিটি কিছুদিন আগে পর্যন্ত ডিটেকটিভমশাইরা পায়ের ছাপ, মাথায় চুল কী এইসব ধরনের জিনিস থেকেই শুরু করেছেন।

(এখন কিন্তু এসব নিয়ম পাল্টে গেছে)। এখনকার ডিটেকটিভরা হত্যাকাণ্ড হবার ঠিক পরেই ঢোকেন গল্পে। তারপর সমস্ত ঘরটি 'পরীক্ষা' করেন। পুলিশ যতোক্ষণে সকলের জবানবন্দী নেবে ততোক্ষণে তিনি ঘরময় হামাগুড়ি দিতে শুরু করেছেন।

পুরো দু'দিন— না, কখনও কখনও তিনদিনও দেখা যায়— ডিটেকটিভ মশাইরা হামাগুড়ি দিয়ে কাটান কার্পেট কি মেঝের ওপরে। যা পান সকলের অলক্ষ্যে তাই পকেটে রাখেন।

তারপর দু'দিন ঘুমের প্রয়োজন।

আসলে এটা কিন্তু ঘুম নয়, সবাই ভাববে ঘুম। ব্যাপারটা জানে শুধু সহকারী। সে জানে, এটাই হলো ওস্তাদের শেষ মার।

এর পরই সকলকে জড়ো করে একজায়গায় এনে দুর্ভেদ্য রহস্য ভেদ করবেন ডিটেকটিভমশাই—

'কেসটা আসলে খুবই সোজা! তবে কয়েকটা অদ্ভুত ব্যাপারের জন্যই এটা উল্লেখযোগ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'সোজা ?' আমি 'থ' হয়ে যাই। ভেবেও যার তল পেলাম না, আর তাই কি না—

'তা ছাড়া আর কি !' বেশ লঘুভাবে বলেন ডিটেকটিভমশাই— 'আমার এই টিকিটের ছেঁড়া টুকরোটা দেখছো তো ?'

সত্যিই কিন্তু তেমন কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না।

'তবে দেখো এই লেন্সের নিচে দিয়ে। কি দেখলে ? টিকিটের ওপর ছাপ পড়ে গেছে 'ATA'— অবশ্য উল্টো করে। এর থেকে কি বোঝা যায় ?'

আমি দারোগার সঙ্গে মুখ চাওয়াচাওয়ি করি— 'কিছুই না।'

'কিছুই না! অনেক কিছুই !' বেশ গম্ভীরভাবে বললেন ডিটেকটিভ— 'ওটার পুরো কথা হচ্ছে BATA। BATA-র নাম শুনেছো তো, বিখ্যাত জুতোর কোম্পানি! দোকানটা এখান থেকে মাত্র চার মাইল পশ্চিমে।'

হা ভগবান! এই সহজ কথাটাও ধরতেও পারিনি আমি!

'আচ্ছা এবারে এই কাদার টুকরোটা দেখো। ঠিক একই রকম ছাপ পড়েছে, এতে উল্টোভাবে— 'IP-TOP'।

'IP-TOP', 'IP-TOP'— বার বার আউড়াতে থাকি আমি। এবারে আর হারতে রাজি নই। কিন্তু এর থেকেই বা কি এমন বেশি বোঝা যাচ্ছে! খুনীর নাম কি এটা ?

'তোমরা দেখতে জানো না— তাই দেখতে পেলে না! আজকাল সব নামকরা লোকেরা জামাকাপড় কোথায় করায় ? তাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব মার্কামারা বোতাম থাকে! 'IP-TOP' হলো সেই বিখ্যাত 'TIP-TOP' এরই অপভ্রংশ। দোকানটা এখান থেকে চার মাইল পূর্বে।'

এবারে আমার মাথা চাপড়াতে ইচ্ছা হলো।

'এবারে বুঝলে ?' আমাদের দিকে কৃপার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন ডিটেকটিভমশাই। 'বিশ্লেষণ করে ফেলো এবারে। আমাদের হত্যাকারী পরেছিলো TIP-TOP-এর তৈরি পোশাক— যা এখান থেকে চার মাইল পূবে আর BATA-র জুতো— যা এখান থেকে চার মাইল পশ্চিমে। সুতরাং হত্যাকারী থাকে, ঠিক এই দুই জায়গার মধ্যবর্তী স্থানে অর্থাৎ এইখানেই।' থামলেন ডিটেকটিভ।

রায়বাহাদুর বিনয়েন্দ্রনারায়ণ সিংহের পায়ের BATA-র জুতো আর জামায় TIP-TOP মার্কা বোতাম থাকায় রহস্যটা পরিষ্কার হয়ে গেলো এবারে। *

---

* Stephen Leacock-এর একটি রচনার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ।

টিনের ঝুমঝুমি

পূর্ণেন্দু পত্রী

বাড়ুজ্যেদের রুমি
মুখুজ্যেদের সদর ঘরের খোলা জানলার কাছে
চুপি চুপি, কেউ সাড়া পায় পাছে,
এগিয়ে এসে বাজালো তার টিনের ঝুমঝুমি।
গাল তুলতুল
এক মাথা চুল
বাড়ুজ্যেদের রুমি।

ঘরের ভিতর বুবু
যোগ-না-মেলা অঙ্ক কষায়
হাতের শূন্য কোথায় বসায়
সেই ধাঁধাতেই খাচ্ছে হাবুডুবু।

ঝুমঝুমিটার শব্দ এসে কানে বাজলো যেই
হারালো তার যোগ-মেলানোর খেই।
ছুটে এল খোলা জানলার ধারে।
মনে পড়লো, আরে!

আজকে যেন কোথায় কোন্ দূরে
কথা ছিল রুমির সাথে বেড়াবে ঘুরে ঘুরে।
দেয়াল-ঘেরা একটুখানি এই সদরের ঘর
সারা সকাল তারই মধ্যে, মন করে সর্-সর্।
এই জানলার বাইরেখানা
আকাশ দিয়ে দেয়াল টানা
মাপা যায় না এত বিশাল বড়ো
রঙ-বেরঙের কত কী যে
কাঁচা পাকা, শুকনো ভিজে,
পাখি পোকা, ফুলের থোকা, সব হয়েছে জড়ো।
গোল বাতাবি, সব্জে আতা,
আনারসের মাথায় ছাতা
মিছরি-ঠাসা পেয়ারা ডাঁসা
এমনি কত ফল
চোখ পড়লেই ঝরায় জিভে জল।
চোখ ছড়ালে আরো অনেক কিছু
চলতে থাকে চোখের পিছু পিছু।
খেঁজুর গাছের টিপির পারে বিশাল বনভূমি।
এ বি সি ডি, ওয়ান টু থ্রি
অঙ্ক কষা, কী বিচ্ছিরি !
ঐখানে কেউ বই পড়ে না, কেবলই দুষ্টুমি !

রইল পড়া শেলেট খাতা
রইল পড়ে ছবির পাতা
মুখথুব্ড়ো সুটকেশটার মুখভর্তি হাঁ।
মা বললে, কোথা যাস্ রে, কিছু খেয়ে যা।
কিসের এত কাজ ?
বুবু বললে, মনমাতলায় মেলা বসবে আজ।

কিম্বা হয়তো ঘটবে একটা কিছু
ঐ যেখানে খালের ধারে আকাশটা খুব নিচু।
দিন-রাত্তির পড়া-খাওয়া-ঘুমের চেয়ে সেটা অনেক বড়ো।
আমি এখন যাব, তুমি সরো।
মা বললে, এসব কথা শুনলে কোথায় তুমি ?
বুবুর চোখে সে কি চাউনি।
বুবু বললে, শুনতে পাওনি ?
বাড়ুজ্যেদের রুমি
এই এখুনি বাজিয়ে গেল টিনের ঝুমঝুমি।

ছবি : পূর্ণেন্দু পত্রী

এই দেশেরই ছেলে নটরাজন

উপন্যাস

মধ্য রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়ে জেগে ওঠে একটা উল্লসিত চিৎকার— পাকিস্তান জিন্দাবাদ !!

সেই চিৎকারের রেশ থেমে যাবার আগেই জেগে ওঠে আর একটা আনন্দধ্বনি— আজাদ কাশ্মীর জিন্দাবাদ !!

মজঃফরাবাদের শহরতলী। এই মজঃফরাবাদ হচ্ছে তথাকথিত আজাদ কাশ্মীরের রাজধানী। মধ্য রাত্রির সেই পাশব চিৎকারে শহরতলীর ঘুমন্ত বাসিন্দারা চমকে জেগে ওঠে। অবশ্য প্রথম দিকে তারা যতোটা চমকে উঠতো, আজ আর ততোটা চমকে ওঠে না। বরঞ্চ ঐ চিৎকারধ্বনি শুনে কেউ কেউ খুশিই হয়ে ওঠে। মনে মনে ভাবে— বাঃ বেশ হয়েছে ! ঠিক হয়েছে ! এবার ঐ দুশমন হিন্দুস্থানের উচিৎ শিক্ষা হবে। গোটা কাশ্মীরটা চলে আসবে পাকিস্তানের অধিকারে।

আবার কেউ কেউ ঐ চিৎকারে দুঃস্বপ্নের মধ্যে জেগে ওঠে। আতঙ্কিত মনে ভাবতে থাকে— তাদের দুর্দশাগ্রস্ত জীবনে আরও দুর্দশা নেমে এলো বলে। কাশ্মীরের ওপর কোনো আঘাতই ভারত নিশ্চয়ই সহ্য করবে না। প্রয়োজন হলে হয় তো পাল্টা আঘাত করতেও ছাড়বে না তারা। আর তার অর্থই হলো, তাদের দুঃখ দুর্দশা একেবারে চরমে উঠবে। খাস পাকিস্তানের জনসাধারণের গায়ে আঁচড়টিও লাগবে না। কেবল পড়ে পড়ে মার খাবে যুদ্ধবিরতি সীমারেখার এপারে খণ্ডিত কাশ্মীরের জনসাধারণ, যারা দীর্ঘদিন ধরে পাকিস্তানের শাসনযন্ত্র দ্বারা অত্যাচারিত, অবহেলিত।

মজঃফরাবাদের শহরতলীর এই প্রান্তেই অবস্থিত বিরাট আধা-মিলিটারী ক্যাম্প ! এই ক্যাম্পেই আজাদ কাশ্মীরের লোকজনদের (এক রকম জোর করেই ধরে এনে) ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছে। পাকিস্তানী মিলিটারী অফিসারদের তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠছে একটা সুশিক্ষিত হানাদার বাহিনী। এরা যুদ্ধবিরতি সীমারেখা পার হয়ে গিয়ে ঢুকবে কাশ্মীরে। অন্তর্ঘাতমূলক কাজের সঙ্গে সঙ্গে অধিকার করবে সমস্ত সরকারী সংস্থা। তাদের আরও বোঝানো হয়েছে যে,

কাশ্মীরের জনসাধারণ তাদের অভিনন্দন জানাতে ব্যগ্র হয়ে অপেক্ষা করছে। সমস্ত রকম সহযোগিতা তারা পাবে তাদের কাছ থেকে।

এই ট্রেনিং সেণ্টারে আজাদ কাশ্মীরের লোক ছাড়া পাকিস্তানী বাহিনীর সৈনিকেরাও রয়েছে। তারাও গ্রহণ করেছে এই বিশেষ ট্রেনিং— হানাদারীর কলাকৌশল। আজাদ কাশ্মীরের লোকদের বিশ্বাস নেই। তাদের একা ছেড়ে দিলে হয়তো তারা কাশ্মীরে ঢুকে ভারতীয় বাহিনীর সঙ্গে মিশে যেতে পারে। পাকিস্তান এদের বিশ্বাস করে না। তাই পাকিস্তানী ফৌজের একটা অংশকে এনে জুড়ে দেওয়া হয়েছে এদের সঙ্গে।

হানাদার ঘাঁটির বিরাট প্রান্তরে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে একশো সৈনিক। নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে তারা হুকুমের প্রতীক্ষা করছে। কিছুক্ষণ আগেই এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহ। মাঝে মধ্যেই বৃষ্টি হচ্ছে দু'-এক পশলা। খণ্ড খণ্ড মেঘ আকাশে। তারই ফাঁকে উঁকি দিচ্ছে অষ্টমীর ম্লান চাঁদ। দূরে আবছা পাহাড়ের সারি। সমস্ত প্রান্তরে একটা আলো-আঁধারি ভাব। চাঁদের সেই ম্লান আলোয় কেবল চকচক করছে সৈনিকদের হাতের অস্ত্রগুলো।

অকস্মাৎ বেজে উঠলো একটা তীক্ষ্ণ বাঁশি। একশো সৈনিক একযোগে অ্যাটেনশন হয়ে দাঁড়ালো। এবার হবে তাদের ইন্‌স্‌পেকশন্।

দুটো ছায়ামূর্তি দৃঢ় পায়ে এগিয়ে এলো তাদের কাছে। গায়ে তাদের হানাদারের পোশাক— সবুজ রঙের সালোয়ার ও কামিজ। দণ্ডায়মান সৈনিকদের গায়েও সেই একই পোশাক। এই পোশাকেই তারা প্রবেশ করবে কাশ্মীরে, যাতে তাদের সৈন্যবাহিনীর লোক বলে চিনতে পারা না যায়।

পাকিস্তান সৈন্যবাহিনীর ক্যাপ্টেন ইয়াকুব খাঁ এই হানাদার দলের নায়ক। আর উপনায়ক লেফটেনাণ্ট আসগর।

টর্চের আলোয় ইয়াকুব খাঁ ও আসগর প্রতিটি হানাদারের পোশাক পরিচ্ছদ, পিঠের সঙ্গে বাঁধা জিনিসপত্র এবং হাতের অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা করলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে। অবশেষে একসময় হুকুম দিলো গাড়িতে ওঠবার জন্যে।

একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলো ছাই রঙের চারখানা মিলিটারী গাড়ি। হুকুম পাওয়া মাত্র হানাদারেরা একে একে গিয়ে উঠলো সেই গাড়িতে। দূরে বেজে উঠলো একটা বিউগলের ধ্বনি। আস্তে আস্তে সামরিক কায়দায় চলতে আরম্ভ করলো ক্যাপ্টেন ইয়াকুব খাঁ। আর সবশেষের গাড়ির ড্রাইভারের পাশে দলের উপনায়ক লেফটেনাণ্ট আসগর— দুই প্রান্তে দুই রক্ষী। আর মধ্যে

একশত শিক্ষিত সৈন্যের এক বাহিনী। এরা স্বদেশ ছেড়ে চলেছে বিদেশে। বিদেশের মাটি কেড়ে এনে স্বদেশকে উপঢৌকন দেওয়ার মতলবে। আসল মতলব তাই কিন্তু মুখে বলতে হচ্ছে মুক্তির কথা। কার মুক্তি? না, সীমা-রেখার ওপারে কাশ্মীরের জনসাধারণের মুক্তি। ভারত নাকি তাদের গোলাম করে রেখেছিলো এতো দিন।

প্রথম গাড়িখানার সামনের দিকে বসে ক্যাপ্টেন ইয়াকুব খাঁও সম্ভবত সেই 'মুক্তির' কথাই চিন্তা করছিলো। ওষ্ঠপ্রান্তে তার জেগে উঠেছিলো একটা মৃদু হাসি। এই হাসি কিসের তা বলা কঠিন। হয়তো ঠিক সেই মুহূর্তে সে নিজেকে কল্পনা করেছিলো সুলতান মামুদ কিম্বা চেঙ্গিজ খাঁর সঙ্গে।

মুখে ভাবান্তর দেখা গেলো ইয়াকুব খাঁর। এবার তার সারা মুখ গম্ভীর হয়ে উঠলো। ভয়ে—দুশ্চিন্তায়। ভয় ভারতীয় রক্ষী বাহিনীকে। আর দুশ্চিন্তা হলো তাদের হাতে নাস্তানাবুদ হবার আশঙ্কায়।

কিন্তু পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নেয় ইয়াকুব খাঁ। নাকের দুইপাশে তরবারির মতো খাড়া হয়ে থাকা আঠা লাগানো সুঁচালো গোঁফ জোড়ার ওপর একবার হাত বুলিয়ে নেয় নিজের অজান্তেই। কোমরে লুকিয়ে রাখা পিস্তলটা শক্তহাতে একবার চেপে ধরেই বিকৃত কণ্ঠে সে বলে ওঠে, দুশমন!

গাড়ি চালাতে চালাতে কথাটা কানে যায় মিলিটারী ড্রাইভারের। দু'হাতে শক্ত করে ষ্টিয়ারিং হুইলটা চেপে ধরে ঘাড় বেঁকিয়ে সে ক্যাপ্টেনকে জিগ্যেস করে— আমায় কিছু বলছেন?

—না। তুমি ঠিক মতো গাড়ি চালাও। কথাটা বলেই গম্ভীর মুখে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকে ইয়াকুব খাঁ।

লোকালয় পার হয়ে এসেছে তারা অনেকক্ষণ। এখন চারিদিকে পাহাড়। মধ্যে সরু পাহাড়ী পথ। দু'পাশে ঘন ঝোপ-জঙ্গল।

গাড়ির জানলা দিয়ে উঁকি মেরে মাথার ওপরের আকাশটা দেখে নেয় ইয়াকুব খাঁ। অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে আকাশ। একটু পরেই চারিদিক ফর্সা হয়ে উঠবে। নিজের রেডিয়াম ডায়ালের হাতঘড়ির দিকে তাকায় সে। বেলা এগারোটা নাগাদ তারা গিয়ে পৌঁছোবে পরবর্তী ঘাঁটিতে। সেখানে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া ও বিশ্রাম। এখনো ঢের দেরি। দেহটাকে আর একটু পেছনের দিকে এলিয়ে দিয়ে, পা দুটো ছড়িয়ে একটু আরাম করে বসে ইয়াকুব খাঁ। তারপর একটা সিগারেট ধরায়।

১লা আগষ্ট ১৯৬৫ সাল। 'উরি'র দক্ষিণে যুদ্ধ বিরতি সীমারেখার আরও সামান্য একটু দক্ষিণে পাকিস্তানের শেষ ঘাঁটি। এই ঘাঁটিতেই এসে উপস্থিত হয়েছে ক্যাপ্টেন ইয়াকুব একশত হানাদার সঙ্গে নিয়ে। দূরে মিটমিট করছে একটা আলো— ভারতীয় রক্ষীবাহিনীর ঘাঁটি। ঐ ঘাঁটিকে কেন্দ্র করেই ভারতীয় ·টহলদার বাহিনী সীমারেখা বরাবর টহল দিচ্ছে। সীমারেখার দু'পাশে এই দুই ঘাঁটির মাঝামাঝি আরও একটা ঘাঁটি আছে— রাষ্ট্রপুঞ্জ পর্যবেক্ষকদের ঘাঁটি।

মধ্যরাত্রি। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। সেই বৃষ্টির মধ্যেই একশত হানাদারের দলটি নিয়ে সীমারেখার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়ে দলনেতা ক্যাপ্টেন ইয়াকুব খাঁ। সঙ্গে উপনায়ক লেফটেনাণ্ট আসগর। প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র গোলা-বারুদ ও খাদ্যসামগ্রী তাদের সঙ্গে। ভারতীয় টহলদার বাহিনীর চোখে ধুলো দিয়ে যুদ্ধবিরতি সীমারেখা অতিক্রম করে কাশ্মীরে প্রবেশ করতে হবে তাদের। অবশ্য এই কাজটুকু এমন কিছু কঠিন নয়। পার্বত্য প্রান্তরে দীর্ঘ সীমারেখার প্রতি ইঞ্চি স্থানে প্রতি মুহূর্তে দৃষ্টি রাখা শুধু ভারতীয় কেন, পৃথিবীর কোনো দেশের কোনো রক্ষী বাহিনীর পক্ষেই সম্ভব নয়। কাজেই রাতের অন্ধকারে সীমারেখা অতিক্রম করে চুপি চুপি পার্বত্য জঙ্গলে গা ঢাকা দেওয়া অতি সহজ-সাধ্য ব্যাপার। (ক্রমশঃ)

●

শীত এসেছে

সরোজ রায়

শহর থেকে আয় বেড়াতে
শীত এসেছে গাঁয়ে,
যাস্‌নে তোরা ইল্লি-দিল্লী
ঠেকবি বিষম দায়ে।
মুগসাউলি চন্দ্রপুলি
সিদ্ধ পিঠে খাস কে ?
এই বেলা সব সার দিয়ে আয়
এলো শীতের মাস যে।

শাকসব্‌জী নিত্য নতুন
টাটকা পাবি কখন ;
রোজ সকালে নলেন গুড়ের
সুবাস যখন তখন ?
ঘরে ঘরে দেখবি কখন
পাকা ধানের রাশি
দেখবি কোথায় সবার মাঝে
শীতের মধুর হাসি ?

রূপকথা

অপরূপ কথা

অতীন মজুমদার

রাজকুমারী চন্দনা। রূপ তার যেন ঠিকরে পড়ে, মুখের কথায় মুক্তো ঝরে। রাজপ্রাসাদের রং-বেরঙের ফুলের বাগানে সে হেসে খেলে নেচে গেয়ে বেড়ায়। তার হাসি দেখে বাগানে ফুলেরা মিষ্টি হাসি হেসে মখমলের পাপড়ি মেলে দিয়ে ফুটে ওঠে। তার খেলা দেখে কাঠবিড়ালী, ফড়িং, প্রজাপতিরা ডালে ডালে, ফুলে-ফুলে লুকোচুরি খেলে বেড়ায়। ময়ূর ময়ূরী তার নাচ দেখে আনন্দে নেচে ওঠে পেখম তুলে। তার গান শুনে খুশির উচ্ছ্বাসে ডালে ডালে ডেকে ওঠে টুনটুনি, দোয়েল, ময়না আর হীরেমন। আজ ক'দিন ধরে সেই রাজকুমারী চন্দনার অসুখ। মুখের হাসি তার শুকিয়ে গেছে। নেই সেই রূপের জলুস। কি এক দুরারোগ্য রোগে শয্যাশায়ী হয়ে রয়েছে। দেহ তার দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে। মুখে কোনো কথা নেই। বাগানে তাকে দেখতে না পেয়ে ফুলেরা তাই ম্লান হয়ে গেছে। কাঠবিড়ালী, ফড়িং, প্রজাপতি তাদের খেলা ভুলেছে। ময়ূর-ময়ূরী নেচে ওঠে না। টুনটুনি, দোয়েল, ময়না, হীরেমন ডেকে ওঠে না।

মা-হারা আদরের একমাত্র মেয়ে চন্দনার এই অবস্থা দেখে রাজা ধর্মপদের

তাই রাজকাজে মন বসে না। তিনি রাজসভায় যান না, বিচারেও বসেন না। দিন নেই, রাত নেই, রাজকুমারীর শিয়রেই চুপ করে বসে থাকেন।

মন্ত্রী বীতপাল রাজার এই অবস্থা দেখে দেশ-বিদেশে লোক পাঠালেন! তারা দেশ-বিদেশ ঘুরে নামকরা সব বদ্যিদের ডেকে নিয়ে এলো। সেই সব বদ্যিদের নির্দেশে হাজার রকমের গাছ-গাছড়া জোগাড় হলো। সেই গাছ-গাছড়ার শিকড় দিয়ে তৈরি হলো হাজার রকম ওষুধ। কিন্তু কোনো ফলই হলো না। রাজকুমারী চন্দনার রোগ ভালো হওয়া দূরের কথা, দিন দিন যেন বেড়েই চললো।

এদিকে রাজা ধর্মপদের রাজ কাজে অবহেলা ও ঔদাসীন্যের ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা শুরু হলো আর এই বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিম সীমান্তের একটি ছোটো সামন্ত রাজ্য চন্দ্রগড়ের রাজা বিক্রমজিৎ বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। মন্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে এই সংবাদ বহন করে নিয়ে এলেন রাজা ধর্মপদের কাছে। তারপর আদেশের অপেক্ষায় তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

কিন্তু রাজা সব শুনেও নির্বিকার। তাঁর মুখ দিয়ে কোনো জবাবই বেরোলো না। রাজকুমারীর অসুস্থতায় তাঁর আর কোনা দিকে মন নেই। রাজ্য-ধন-দৌলত সবই যেন আজ তাঁর কাছে তুচ্ছ।

বুদ্ধিমান মন্ত্রী বীতপালের রাজার মনের অবস্থা বুঝে নিতে এতোটুকু দেরি হলো না। তিনি ফিরে গেলেন। তারপর রাজ্যের এই বিপদের সময় নিজের হাতেই শাসনের ভার তুলে নিয়ে বিক্রমজিৎকে দমন করার জন্যে প্রধান সেনাপতি মাধবগুপ্তকে পঞ্চাশ হাজার সৈন্য দিয়ে পাঠালেন।

বেশ কিছুদিন ধরে যুদ্ধ চললো। দু'পক্ষেরই প্রচুর ক্ষয়-ক্ষতি হলো। বহু সৈন্য মারা গেলো। শেষে বিক্রমজিৎ পরাজিত ও বন্দী হলেন। তবে দুঃখের বিষয়, যুদ্ধ জয়ের পর সেনাপতি মাধবগুপ্তকে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না। যুদ্ধ চলাকালীন একদিন রাতে মাধবগুপ্ত তার শিবিরে ঘুমিয়ে ছিলো। পরদিন যখন ভোর হলো, দেখা গেলো তার শিবির শূন্য। তার শয্যার পাশে রক্তের দাগ। চারদিক তন্ন তন্ন করে খোঁজা হলো, কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেলো না। তার জন্যে বেশ কিছুদিন তারা অপেক্ষা করলো, তারপর বিজয়ী সৈন্যদল বন্দী বিক্রমজিৎ সহ রাজ্যে ফিরে এলো।

বন্দী বিক্রমজিৎকে কারাগারে সতর্ক পাহারাধীনে রাখা হলো। মন্ত্রী বীতপাল প্রাসাদে গিয়ে রাজাকে যুদ্ধজয়ের সুসংবাদ জানালেন, তবে সেনাপতি মাধবগুপ্তের কোনো কথাই তিনি রাজাকে বললেন না। কারণ তিনি রাজার

বর্তমান মানসিক অবস্থার কথা ভেবে তা গোপন রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ বলে মনে করলেন।

আরো কিছুদিন কেটে গেলো। একদিন এক ঘটনা ঘটলো।

গভীর রাত। রাজা অসুস্থা রাজকুমারীর শিয়রে বসে আছেন। রাজকুমারী ঘুমোচ্ছে। রাজারও বোধহয় একটু তন্দ্রা মতন এসেছিলো। হঠাৎ তাঁর তন্দ্রা ভেঙে গেলো। তিনি যেন একটা গোঙানির শব্দ শুনতে পেলেন। মনে হলো, প্রাসাদের বাইরে কোথাও থেকে শব্দটা ভেসে আসছে। শব্দটা ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগলো। রাজা ভাবলেন, শব্দ শুনে হয়তো রাজকুমারী এখনই জেগে উঠবে। তাই তিনি তখনই প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে এলেন। তারপর সেই গোঙানির শব্দ অনুসরণ করে এগিয়ে চললেন।

কিছুক্ষণ চলার পর শেষে একটি কুঁড়ে ঘরের সামনে এসে থামলেন। তাঁর মনে হলো, গোঙানির শব্দটা কুঁড়ে ঘরটির মধ্য থেকেই আসছে। তিনি তার ভেতরে ঢুকলেন। দেখলেন, একটি ছোট্ট মেয়ে শূন্য মেঝেতে শুয়ে আছে। অনাহারে তার প্রায় মুমূর্ষু অবস্থা। ঠাণ্ডায় সারা শরীর কাঁপছে। তার মুখ দেখে মনে হচ্ছে, সারা দেহে সে কী যেন এক অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করছে।

রাজা তার গায়ে হাত দিলেন। দিতেই তিনি চমকে উঠলেন। মেয়েটির সারা শরীর যেন জ্বরে পুড়ে যাচ্ছে! এবার তিনি ঘরটির চারিদিকে ভালো করে তাকালেন। কেউ কোথাও নেই। তিনি কিছুক্ষণ আপন মনে কি যেন ভাবলেন। তারপর মেয়েটিকে কোলে তুলে নিয়ে কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে, প্রাসাদের দিকে চলতে শুরু করলেন।

রাজা প্রাসাদে যখন ফিরে এলেন, তখন ভোর হয়েছে। তিনি সোজা অতিথিশালায় গেলেন। তারপর অতিথিশালার পরিচালককে ডেকে তখনই তার চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষার আদেশ দিলেন। তারপর প্রাসাদে রাজকুমারীর শিয়রে এসে দাঁড়ালেন।

কিন্তু একি? রাজা আশ্চর্য হয়ে দেখলেন, রাজকুমারী নেই! তার শয্যা শূন্য! রাজা পাগলের মতন সারা প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষ খুঁজতে লাগলেন। দাস-দাসীরাও তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুঁজি শুরু করলো। কিন্তু কোথায় রাজকুমারী চন্দনা?

রাজা রাজকুমারীকে প্রাসাদের কোথাও দেখতে না পেয়ে যখন দুঃখে একেবারে মুষড়ে পড়েছেন, ঠিক সেই সময়ে তাঁর কানে ভেসে এলো হাসির

খিলখিল শব্দ। তাঁর মনে হলো, এ শব্দ যেন বাগান থেকেই ভেসে এলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটে গেলেন বাগানে। সেখানে গিয়ে যা দেখলেন তাতে তিনি রীতিমতো অবাক হয়ে গেলেন। বাগান আলো করে রং-বেরঙের অজস্র ফুল ফুটে উঠেছে। কাঠবিড়ালী, ফড়িং, প্রজাপতিরা লুকোচুরি খেলা শুরু করেছে। ময়ুর-ময়ুরীরা আনন্দে পেখম মেলে নেচে উঠেছে দোয়েল, টুনটুনি ময়না, হীরেমন খুশিতে গান ধরেছে। আর রাজকুমারী চন্দনা একটা ছোট্ট ছেলের সঙ্গে মনের আনন্দে হেসে-খেলে নেচে-গেয়ে বেড়াচ্ছে। রাজকুমারীকে দেখে মনেই হচ্ছে না এতোদিন ধরে সে রোগশয্যায় শুয়ে ছিলো।

আনন্দে রাজার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। তিনি অপলক দৃষ্টিতে তাদের খেলা দেখতে লাগলেন।

বেশ কিছুক্ষণ পর রাজকুমারী চন্দনা রাজাকে দেখতে পেয়ে ছোট্ট ছেলেটির হাত ধরে তাঁর কাছে ছুটে এলো। রাজা খুশির উচ্ছ্বাসে দু'জনকেই বুকে জড়িয়ে ধরতে রাজকুমারী চন্দনা বলে উঠলো, সে তার শয্যায় ঘুমিয়েছিলো; হঠাৎ খুব ভোরে কার যেন হাতের ছোঁয়া পেয়ে তার ঘুম ভেঙে গেলো। সে চোখ মেলে চাইতেই দেখতে পেলো, এই ছোট্ট ছেলেটি তার দিকে চেয়ে হাসছে আর তার কপালে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। চন্দনাকে জাগতে দেখে সে বলে উঠলো, 'তোমার জন্যে আমি কখন থেকে অপেক্ষা করছি। তোমার তো সব অসুখ ভালো হয়ে গেছে, তবু এখনও ঘুমোচ্ছো? চলো, বাগানে গিয়ে আমরা খেলবো!' এই বলে সে চন্দনার হাত ধরে, তাকে শয্যা থেকে তুলে, বাগানে নিয়ে আসে।

রাজা চন্দনার কথা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। ছেলেটিকে আদর করে জিগ্যেস করলেন, 'তুমি কোথায় থাকো?' জবাবে ছেলেটি জানালো, প্রাসাদের বাইরে। রাজা ভাবলেন, হয়তো তাঁরই কোনো প্রজার ছেলে। এবার তিনি বললেন, 'আমি তোমার জন্যেই চন্দনাকে ফিরে পেয়েছি। তুমি কি চাও, বলো? যা চাইবে, আমি তোমাকে তাই দেবো।'

ছেলেটি জবাবে বললো, 'আপনি আমায় কাল যা দিয়েছেন, তাই যথেষ্ট। আমি আর কিছু চাইনে।' এই বলে সে বাগান থেকে বেরিয়ে প্রাসাদের বাইরে চলে গেলো।

রাজা অবাক হয়ে গেলেন, তিনি কি দিয়েছেন? কই, কিছুই তো দেন নি। তাছাড়া ছেলেটিকে এর আগে তিনি কখনো দেখেনও নি। তবে?

রাজা চিন্তিত মনে রাজকুমারীকে নিয়ে প্রাসাদে ফিরে গেলেন।

রাজা এখন যথারীতি রাজকাজ দেখা শোনা করছেন। তাঁর প্রিয়পাত্র সেনাপতি মাধবগুপ্তর নিখোঁজের সংবাদ শুনে খুবই মর্মাহত হয়েছেন। মনে মনে তিনি স্থির করেছেন, বন্দী বিক্রমজিৎকে কঠিন শাস্তি দেবেন। কারণ এর জন্য দায়ী সে-ই। সে যদি বিদ্রোহ ঘোষণা না করতো, তাহলে হয়তো এই অকালে মাধবগুপ্তকে হারাতে হতো না। তাছাড়া তার ঐ বিদ্রোহের ফলে বহু সৈন্য মারা গেছে, প্রচুর ক্ষয় ক্ষতিও হয়েছে।

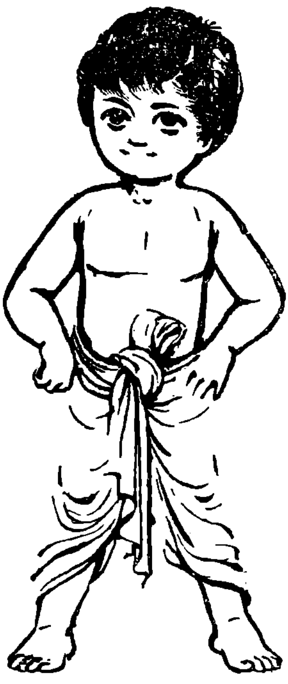

আজ রাজা বিচারে বসবেন। দুপুরবেলা বিচার হবে। রাজা সকালে বাগানে এসে রাজকুমারী চন্দনার খেলা দেখছেন। হঠাৎ তিনি দেখতে পেলেন, সেই ছোট্ট ছেলেটি বাগানে এসে ঢুকলো। তাকে দেখতে পেয়ে চন্দনা ছুটে এলো। কিন্তু ছেলেটির সেদিকে নজর নেই। সে সোজা রাজার কাছে এসে দাঁড়ালো। রাজা তাকে দেখে আনন্দে কোলে তুলে আদর করতে লাগলেন। আদর করতে করতে হঠাৎ একসময়ে ছেলেটির হাতে আর পায়ের দিকে নজর পড়তেই তিনি চমকে উঠলেন। একি? তার হাত দুটো আর পা দুটো কে যেন পেরেক দিয়ে মেরে ফুটো করে দিয়েছে! কপালেও গভীর ক্ষত চিহ্ন!

রাজা রেগে বলে উঠলেন, 'একি? কে তোমার হাত আর পায়ের অবস্থা এরকম করেছে? বলো, আমি তাকে কঠোর সাজা দেবো।'

ছেলেটি ম্লান হেসে জবাব দিলো, 'না, আঘাতের প্রতিদান আঘাত নয়— ভালোবাসা। মানুষেরাই আমাকে আঘাত করেছে, কিন্তু আমি তাদের প্রত্যেককেই ক্ষমা করেছি— ভালোবেসেছি। আর আপনাকেও তাই বলতে এসেছি— আপনিও ক্ষমা করুন, ভালোবাসুন।' এই বলে সে রাজার কোল থেকে নেমে আস্তে আস্তে বাগান থেকে বেরিয়ে গেলো। রাজা তার যাওয়ার পথের দিকে চেয়ে গভীর চিন্তায় মগ্ন হলেন।

দুপুরে বিচারসভায় সেদিন মন্ত্রী, পাত্র-মিত্র, সভাসদরা রাজার বিচার দেখে অবাক হয়ে গেলেন। যে অপরাধের একমাত্র শাস্তি মৃত্যুদণ্ড, সেই অপরাধে অপরাধী বিক্রমজিৎকে রাজা ক্ষমা করলেন— সসম্মানে মুক্তি দিলেন। আর সেই মুহূর্তে বিক্রমজিৎ-এর মুক্তি ঘোষণা করা হলো, সেই মুহূর্তে সকলকে অবাক করে, সেনাপতি মাধবগুপ্ত বিচারসভায় এসে ঢুকলো।

তার মুখেই সকলে শুনলো, সে যখন রাতে তার শিবিরে ঘুমোচ্ছিলো, সেই সময় শত্রুপক্ষের একজন তার শিবিরে ঢুকে তাকে ছুরিকা দিয়ে হাতে আঘাত করে। কিন্তু তখনই জেগে ওঠাতে, সে পালিয়ে যায়। সে তখন তার পিছু ধাওয়া করে এক গভীর বনে গিয়ে ঢোকে। তারপর সেই আততায়ী কোথায় যে অদৃশ্য হয়ে যায়, তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন সে সেই বন থেকে বেরোবার চেষ্টা করে কিন্তু পথ হারিয়ে ফেলে। এতোদিন ধরে সেই বন থেকেই বেরোবার পথ খুঁজে সে পাগলের মতো ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিলো। আজ সকালে হঠাৎ একটি ছেলে তাকে সেই বন থেকে বেরোবার পথ দেখিয়ে বাইরে আনে। ছেলেটির হাতে পায়ে কপালে কিসের যেন আঘাতের চিহ্ন।*

* যীশুখ্রীষ্টের উপদেশ অনুসরণে

●

শত্তুর শীতকাল

স্বপ্না চৌধুরী

শীত নয়, শীত নয়, বড়ো এক শত্তুর।
দিন রাত করে শীত, দূর ছাই দূর দূর।
উত্তুরে হাওয়া আসে বন্ বন্, শন্ শন্।
শীত কালে জল খেয়ে দাঁত করে টন্‌টন্।
কন্‌কনে ঠাণ্ডায়— ফাটে হাত ঠোঁট গাল,
হুটোপুটি করে এলো শত্তুর শীতকাল।
কাঁপে হাড় ঠক্ ঠক্, এই বুঝি খসে যায়।
নিদারুণ ঠাণ্ডাতে, প্রাণটারে রাখা দায়।
একটাই ভালো এর মনে পড়ে যদ্দুর—
নিয়ে আসে সাথে করে, মিঠে-কড়া রোদ্দুর!

বিচিত্রা

নামকরণ

চুনীলাল রায়

বেশ কয়েকমাস আগে পত্রিকায় প্রকাশিত একটি খবর পড়ে, আমার মতো তোমরা অনেকেই নিশ্চয় হেসেছিলে। খবরটা হলো এই যে, ভারতের অন্যতম বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা পরলোকগত ডঃ রামমনোহর লোহিয়া নিজেকে 'ঘেরাও বাবা' বলে অভিহিত করেছিলেন।

খবরটা নিশ্চই আমাদের খুব হাসির খোরাক যোগায় সন্দেহ নেই। কিন্তু জেনে রাখো, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিজেদের নাম ছাড়াও তাঁদের অন্যভাবে, কখনও শ্রদ্ধা করে কখনও বা আদর করে ডাকা হয়। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামের সাথে বিভিন্ন বিশেষণ যোগ করে তাঁদের পরিচয় আমরা দিয়ে থাকি।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে আমরা 'জাতির জনক' বলে শ্রদ্ধা করি। কিন্তু এ ছাড়াও তিনি সর্বত্র 'বাপুজি' এই নামেই বিশেষ পরিচিত। 'বাপুজি' কথারও অর্থ 'পিতা।' তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিণী, কস্তুরবাকেও সবাই ছোট্ট একটি কথায়, 'বা' বলেই ডাকে।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও তেমনি 'গুরুদেব' নামেই তাঁর শান্তিনিকেতনের ছাত্রদের কাছে একদিন বিশেষ পরিচিত ছিলেন। আজ শুধু শান্তিনিকেতন কেন, সর্বত্রই তিনি 'গুরুদেব' — 'গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ' নামে খ্যাত।

হিটলারের নাম আশা করি তোমরা সকলেই শুনে থাকবে। তাঁকে তাঁর দেশবাসী 'ফ্যুয়েরার' বলে ডাকতো। জার্মান ভাষায় 'ফ্যুয়েরার' কথার অর্থ হলো, 'ত্রাণকর্তা'। এ প্রসঙ্গে জেনে রাখো, সুভাসচন্দ্র বসুকেও অনেক সময় 'ভারতীয় ফ্যুয়েরার' বলা হয়।

পাকিস্তানের বিশিষ্ট নেতা মহম্মদ আলী জিন্না সাহেব তাঁর দেশবাসীর কাছে 'কোয়াদ-ই-আজম' অর্থাৎ 'বড়ো নেতা' বলে সম্মান পেয়েছেন।

ইন্দোনেশিয়ার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সুকর্ণকে তাঁর দেশবাসী 'বা' (ভাই) কর্ণ বলে ডেকে থাকে। 'রাষ্ট্রগুরু' সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন বাংলার 'মুকুটহীন রাজা।'

আমরা স্বর্গত চিত্তরঞ্জনকে 'দেশবন্ধু' বলে জানি। যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত আর বীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে যথাক্রমে 'দেশপ্রিয়' ও 'দেশপ্রাণ' বলে ডাকা হয়! নেতাজী সুভাষকে আমরা 'দেশ গৌরব' বলেই অভিহিত করি।

ভারতের স্বাধীনতাসংগ্রামের বিশিষ্ট নেতা বাল গঙ্গাধর তিলক সমস্ত দেশের 'লোকমান্য' ছিলেন।

ভারতের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ্ চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারি সর্বত্র 'রাজাজি' নামে সুপরিচিত।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কেবল বিদ্যারই সাগর নন, তিনি 'দয়ার সাগর' নামেও পরিচিত ছিলেন।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায় 'বাংলার বাঘ' নামে পরিচিত। এই প্রসঙ্গে জেনে রাখো, ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ক্লেমেন্সুকে বলা হতো 'ফরাসী-ব্যাঘ্র'।

উড়িষ্যার বিখ্যাত নেতা পণ্ডিত গোপবন্ধু দাস 'উৎকলমণি' অর্থাৎ 'The Jewel of Orissa' নামে খ্যাত ছিলেন।

ইতালীর বিশিষ্ট নেতা 'মুসোলিনীকে 'Il Duce' (ইল ডুচে) বলা হয়।

বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে আলীভাইদের কথা তোমরা আশা করি শুনে থাকবে। এঁদের মধ্যে সৌকত আলী ছিলেন বেশ মোটা লম্বাচওড়া। এই জন্য তিনি সকলের কছে 'Big Brother' নামেই পরিচিত ছিলেন।

আগে কংগ্রেস দলে পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর মতো আন্তর্জাতিক জ্ঞান খুব কম জনেরই ছিলো এবং তিনিই কংগ্রেসের সব বড়ো বড়ো প্রস্তাবগুলি তৈরি করতেন। এই কারণে কংগ্রেস মহলে তিনি 'CONGRESS DRAFTSMAN' ও 'MR. INTERNATIONAL SITUATION' নামে বিখ্যাত ছিলেন।

তোমরা একথা নিশ্চয়ই জানো, পরবর্তীকালে 'পণ্ডিতজি'কে দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়েরা তাদের প্রিয় 'চাচাজি' বলেই জেনেছে।

এককালে সমস্ত কংগ্রেস দলে ভুলাভাই দেশাইর মতো আইনজ্ঞ ব্যক্তি খুব কমই ছিলেন, এজন্য, তিনি 'LEGAL REMEMBRANCER' আখ্যা পেয়েছিলেন।

বাংলাদেশের অন্যতম বিশিষ্ট নট ও নাট্যকার স্বর্গীয় অমৃতলাল বসু 'রসরাজ' উপাধি পেয়েছিলেন।

কাব্যে অপূর্ব ছন্দের ধ্বনি মাধুর্য সৃষ্টি করার জন্য কবিবর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তকে 'ছন্দের যাদুকর' বলা হয়, এ কথা সর্বজনবিদিত।

কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের কবিতায় দুঃখবাদ প্রকাশ পেয়েছে বেশি, তাই তিনি 'দুঃখের কবি' বলে পরিচিত।

কাজি নজরুল ইসলাম 'ধূমকেতু'র মতো প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে বাংলা-সাহিত্যে

আবির্ভূত হয়েছিলেন। যা কিছু পুরাতন সবকিছু হটিয়ে দিয়ে নতুন করে গড়তে চেয়েছিলেন, তাই তিনি 'বিদ্রোহী কবি'।

বিদেশের কবি উলফ্রেড আওয়েন 'WAR POET' নামে বিখ্যাত।

বাংলাদেশের বিখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় গোষ্ঠ পাল 'চীনের প্রাচীর' নামে ক্রীড়ামোদীদের কাছে সুপরিচিত। সামাদ— ফুটবলের যাদুকর; ধ্যানচাঁদ 'হকির যাদুকর'— WIZARD OF THE STICK.

●

ভূমি এবং জল

বিক্রমাঙ্ক দেব

আমি জুতাটি খুলে মোজাটি খুলে
বালিতে দৌড়ে একা ;
দেখি অগ্রে জল, পশ্চাতে ভূমির
জীর্ণ মলিন রেখা।
আমি দেখেছি জলের গড়িয়ে চলা
শান্ত সমুদ্রতটে,
আমি শুনেছি বন্য পাখীর ধ্বনি
নিশ্চুপ ভূমিপটে।
ভূমিতে আঘাত পেয়ে ফিরে আসে
স্বচ্ছ স্রোতের জল ;
আমি সেই জলেতে রাখি হাত-পা
স্পর্শিতে জলতল।
আমি জুতাটি পরে মোজাটি পরে,
বল তো দেখি তুমি,
কেন জলকে জানিয়ে শুভ বিদায়
ভূমিকে দিচ্ছি চুমি ?

Leonard Clark-এর 'Land and Water' কবিতার অনুবাদ।

ভোম্বলের গোয়েন্দাগিরি

অসিত গুপ্ত

গরমের ছুটিতে ভোম্বল মামার বাড়ি বেড়াতে গেলো। ওর মামার বাড়ি হচ্ছে ভাগলপুরে, মামীমা অনেকদিন ধরেই লিখছিলেন— 'ভোম্বল একবার এখানে বেড়িয়ে যাস।' তা ভোম্বল যায়নি। না-যাওয়ার আসল কারণ হচ্ছে ওর মামা। মামাকে ভোম্বল জীবনে একবারই মোটে দেখেছে। কিন্তু সেই প্রথম দেখার সময় যা ভয় ঢুকে গিয়েছিলো, সে ভয় এখনো ওর যায়নি।

ওর মামা ভাগলপুরের জুবিলি কলেজে অঙ্ক কষান। অঙ্ক কষাতে কষাতে ওঁর চেহারা আর মেজাজটা কিরকম জটিল হয়ে গিয়েছিলো। ভোম্বলকে প্রথম দিন দেখেই এক সরল করতে দিয়েছিলেন। সেই থেকে ভোম্বলের ধারণা, লোক জটিল না হলে কেউ প্রথম দিনেই ভাগ্নেকে সরল করতে দেয়? তার ওপর মামার ছিলো ইয়া লম্বা দাড়ি আর বড়ো বড়ো লাল চোখ লাল।

তাই ভোম্বল কিছুতে মামার বাড়ি যেতে চাইতো না। যতোবারই মামার বাড়ি যাবার কথা উঠতো, ভোম্বল এড়িয়ে যেতো।

কিন্তু এবার ওকে যেতেই হলো। কারণ, ভোম্বলের মা তাঁর ভাইকে আর না দেখে থাকতে পারছিলেন না। তাছাড়া, এতোদিনে ওর মামা-ভীতি একটু কমেছিলো, বয়স তো বাড়ছে! মামাকে ভয়— লোকে শুনলে বলবে কী। কিন্তু ভয় কমার আরো একটু ব্যাপার ছিলো।

এর মধ্যে ভোম্বল এন্তার গোয়েন্দা গল্প পড়ে ফেলেছিলো। খাটের তলায় ঢুকে, পড়ার বইয়ের নিচে চাপা দিয়ে, সিঁড়ির তলায় ঘুঁটের বস্তার ওপর বসে ঘামতে ঘামতে, একটাও ডিটেকটিভ বই ও বাদ রাখেনি। বিমল-কুমার, জয়ন্ত-মানিক, কিরীটী রায়, হুক্কাকাশি কাউকে ছাড়েনি।

পড়ে বুঝেছে, এদের কি সাহস! গোয়েন্দাদের সাহস না হলে কখনো চলে! ভোম্বলও যে গোয়েন্দা হতে চায়! সুতরাং ভোম্বলেরও সাহস চাই। তাছাড়া বইতে কোথাও লেখা নেই যে, ঐ সব নামজাদা গোয়েন্দারা তাদের মামাকে ভয় করতো।

এমন কি, পুরোদস্তুর গোয়েন্দা হবার জন্যে ভোম্বল চুপি চুপি একবার এক

কাণ্ড করেছিলো। জয়ন্ত মানিকের গল্পে আছে যে, যখনই মাথায় কোনও নতুন বুদ্ধি খেলতো, তখনই ঘন ঘন নস্যি নিতো জয়ন্ত। ভোম্বলও তাই দেখাদেখি টিফিনের পয়সা থেকে বাঁচিয়ে চার পয়সার নস্যি কিনেছিলো। খুব সাবধানে লুকিয়ে লুকিয়ে দু'-একবার টেনে দেখেছিলো, যদি কোনো বুদ্ধি খেলে। কিন্তু বুদ্ধি খেলছে কি না পরখ করবে কী করে ?

মামলা কোথায়! কোনো সুন্দরবাবু হুম-হুম করতে করতে এসে তো রত্ন চুরির খবর কিম্বা হিমালয়ের ভয়ঙ্করের কথা বলছেন না! অতো কথা কি, বাড়িতে পর্যন্ত একটা ছোটোখাটো গোয়েন্দাগিরির সুযোগ পেলো না ভোম্বল।

ভাগলপুরে গিয়ে ভোম্বলের কিন্তু মস্ত লাভ হলো। গোয়েন্দাগিরির দিক থেকে লাভ। যেতেই মামী বললেন বটে, 'আয়, আয় বাবা ভোম্বল।' কিন্তু ভোম্বলের চোখ মামী এড়াবেন কী করে! মুখ দেখেই সে বুঝলো, কিছু একটা ব্যাপার হয়েছে। নইলে মামীর মুখ অতো শুকনো কেন!

ভোম্বল যা ভেবেছিলো, ঠিক তাই। সন্ধ্যেবেলা মামী তাঁর দুঃখের কথা বলছিলেন ভোম্বলের মার কাছে। ভোম্বল খাবার ঘরে বসে ভাগলপুরের বিখ্যাত সাহী-টোষ্ট খেতে খেতে শুনলো ব্যাপারটা।

ভোম্বলের মামীমা বলেছিলেন, 'কি আর বলবো ঠাকুরঝি! আজ কতোদিন হলো প্রায়ই পঁয়ষট্টি নয়া পয়সা করে চুরি যাচ্ছে আমার, কিছুতেই ধরতে পারছি না, কি করে যাচ্ছে!'

মা গালে হাত দিয়ে বললেন, 'বলো কি বৌদি, এ-তো ভালো কথা নয়। বাড়িতে চোর পুষে রাখা খুব ভয়ের কথা।'

'তারপর শোনো, পঁয়ষট্টি নয়া পয়সা যাচ্ছিলো যাচ্ছিলো— ও মা সেদিন দেখি, ওঁর ঘড়িটা পর্যন্ত নেই।'

শুনেই ভোম্বল মনে মনে সাজিয়ে নিলো সব ব্যাপারটা। প্রথমতঃ পয়সা চুরি যাওয়া, দ্বিতীয়তঃ ঘড়ি চুরি যাওয়া, বাড়িতে সন্দেহ করার মতো কে কে আছে! এক হচ্ছে, রামখিলোন চাকর। দুই, লছমি দাই। আর তিন…এই তিন নম্বরে এসে ভোম্বল একটু ভাবতে লাগলো।

ভোম্বল দেখেছে, পাকা গোয়েন্দারা কাউকে সন্দেহ করতে ছাড়ে না। প্রথম থেকেই তারা ধরে নেয়, অপরাধী যে-কেউ হতে পারে। তাই, ভোম্বল তিন নম্বরে তার মামাতো ভাই আঁটটিলকে ফেললো! আঁটটিলের ভালো নাম অবশ্য জীমূতবাহন।

সে দু'দিন ভাগলপুরে এসে ঠিক জেনে ফেললো যে, আঁটটিল লেখাপড়ায়

বেদম ফাঁকি দেয়। আর, আদমপুরের কাছে ওর এক আড্ডা আছে। সুতরাং ওকে সন্দেহ করা চলতে পারে।

ভোম্বল একদিন সোজাসুজি ওর মামীকে গিয়ে বললো, 'আচ্ছা, সব ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলো তো মামীমা। কিছু বাদ দিও না। তোমাদের কাছে যা দরকারী মনে হয় না, আমাদের কাছে তা দরকারী।'

মামীমা তো অবাক। 'কী খুলে বলবো রে? কী দরকারী?'

'ওমা! তুমি বুঝি জানো না বৌদি, ছেলে যে শখের টিকটিকি!'

'কিসের টিকটিকি?'

'আহা বল না ভোম্বল, কি যে বলে ছাই, ঐ যে যারা চোর, ডাকাত খুনে এই সব ধরে গো……'

'টিকটিকি নয়, ডিটেকটিভ।' রাসভারী গলায় বললো ভোম্বল।

মামীমা বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ তাদের কথা আমি খুব জানি। কিন্তু তুই কী জানতে চাইছিলি, বলতো ভোম্বল?'

'তোমার টাকা-পয়সা কোথায় থাকে?'

'কেন ক্যাশবাক্সে!' মামী বললেন।

'সেই ক্যাশবাক্সের চাবি থাকে কার কাছে?'

'আমার কাছে থাকে বাবা। এই দেখ না, আমার আঁচলে রয়েছে। অবশ্য তোর মামার দরকার হলে খোলেন। উনি যা ভুলো লোক সেই জন্যে ওঁর কাছে টাকা-পয়সা কিছু রাখি না।'

'হুঁ। আচ্ছা, বাক্সটা বাইরে থেকে ভেঙেছিলো কেউ··· কোনোদিন?'

'না, না, সে সব কিছু হয় নি বাবা। খালি পয়সা মেলাতে গিয়ে দেখি প্রায়ই পঁয়ষট্টি নয়া পয়সা করে কম পড়ে। বাক্স যেমনকার তেমনি আছে।'

'আচ্ছা মামীমা, তুমি কি খুব ঘুমোও?'

ভাগ্নের কথা শুনে মামীমা হতভম্ব হলেন।

'ঘুম কী বলছিস। আমার বলে মরবার ফুরসৎ নেই। ঘুম সেই একেবারে তে-রাত্তিরে··· কিন্তু ঘুমের কথা কেন তুই জিগ্যেস করছিস?'

'না, মানে আমি জানতে চাইছি, তুমি যখন-তখন ঘুমিয়ে পড়লে আঁচল থেকে তোমার কেউ চাবি খুলে নেয় কি না।'

ভোম্বলের কথা শুনে মামীমা হেসেই সারা হলেন।

ভোম্বল তখনকার মতো চুপ করে গেলো।

কিন্তু ক'দিন পরেই আবার পঁয়ষট্টি নয়া পয়সা হাওয়া হয়ে গেলো ক্যাশবাক্স থেকে। যে রকম নিয়ম আছে, ভোম্বল, গিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে এলো। আগে কাউকে ঘটনাস্থলের ত্রিসীমানায় যেতে দিলো না। প্লাষ্টার অফ প্যারিস নেই, সুতরাং অপরাধীর পায়ের ছাপ বা হাতের ছাপ কিছুই নেওয়া গেলো না।

তবু, ভোম্বল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখলো। তারপর ক্যাশবাক্সের গা থেকে কি একটা জিনিস আলগোছে তুলে নিয়ে, একটুকরো কাগজে মুড়ে, নিজের হাফ-প্যাণ্টের পকেটে রাখলো।

ওর কাণ্ড দেখে তো সবাই অবাক। মামাতো ভাই আঁটটিল শুধু মুচকি মুচকি হাসতে লাগলো। তারপর বললো, 'কি রে ভোমলা, তুই খুব ভড়কি দেখাচ্ছিস, দেখতে পাচ্ছি!'

ভোম্বল একটুও দমলো না, সে জানে, অপরাধীরা সব সময় গোয়েন্দাদের ভয় দেখিয়েই থাকে। আঁটটিল অপরাধী কি না তা কে বলবে? সে খুব গম্ভীর গলায় বললো, 'সকলকার সব ভড়কি কিছু দিনের মধ্যেই বেরিয়ে যাবে।' তারপর হঠাৎ আঁটটিলকে হকচকিয়ে দিয়ে বললো, 'আদমপুরে কী করা হয়? বলবো মামাকে?'

আঁটটিল আমতা-আমতা করে সেখান থেকে পালিয়ে বাঁচে। সহজে আর ভোম্বলের মুখোমুখি হয় না।

ভোম্বলরা সেদিন কলকাতায় ফিরবে। সকলে একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া হচ্ছিলো। মামা পর্যন্ত কলেজ থেকে ছুটি নিয়েছেন। রামখিলৌন চাকর,

লছমি দাই সবাই আছে। তারা ভোম্বলের মার কাছ থেকে বখশিস পাবে—সেই আশায় শেষদিন ছুটে ছুটে কাজ করছিলো, মামী আছেন, আঁটটিল আছে, ছোটো মামাতো বোন বিনুনী আছে।

সেই সময় ভোম্বল হঠাৎ মাঝ পথে খাওয়া থামিয়ে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়ালো। অবাক হয়ে মামী শুধোলেন, 'কি বাবা ভোম্বল, কোনো অসুবিধে হচ্ছে ?'

ভোম্বল সে কথার জবাব দিলো না। ভারিক্কি গলায় আদেশ করলো, 'রামখিলৌন দরোয়াজা বন্ধ কর দো।'

সকলে অবাক। রামখিলৌন গুটি গুটি গিয়ে দরজা বন্ধ করে এলো। ভোম্বল গলা সাফ করে··· সকলের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে বললো, 'জানো মামী, চোর আমাদের মধ্যেই আছে।'

মামী বললেন, 'বলিস কিরে ভোম্বল।'

'হ্যাঁ মামী। প্রথমেই আমি সন্দেহ করেছিলাম রামখিলৌন আর লছমিকে। কিন্তু ওরা পয়সা নিতো না। চাবি পাবে কোথায়। মামীমা তো কখনো ঘুমোয় না আর চাবি আঁচল-ছাড়া করে না। ক্যাশবাক্স ভাঙা অবস্থাতেও কোনো দিন পাওয়া যায় নি। তবু, আমি সন্দেহ করা ছাড়লাম না। যদি ওরা কেউ কিম্বা আঁটটিল আরেকটা চাবি করিয়ে থাকে।'

'সব বাজে কথা। আমি কোনো চাবি করাই নি।' আঁটটিল বললো।

'আমি তা জানি। তোমার একদম সাহস নেই, তুমি ভীতুর ডিম। তাই আদমপুরে যেখানে তুমি অড্ডা দিতে যাও, সেখানকার দুবে বলে একটা ছেলে তোমার কাছ থেকে ওয়েষ্ট-এণ্ড ঘড়িটা কেড়ে রেখে দিয়েছে, সেটা আজো পর্যন্ত আদায় করতে পারো নি।'

'অ্যাঁ!' মামীমা আঁতকে উঠলেন। 'তুই ঘড়ি নিয়েছিলি ?'

'না, মামীমা ও ঘড়ি চুরি করে নি। বন্ধুদের দেখাবার জন্যে একদিন শখ করে পরে গিয়েছিলো। দুবে বলে ছেলেটা হচ্ছে মহা পাজি। সে ওটা কেড়ে নিয়ে আর ফেরৎ দিচ্ছে না, আমি যখন পয়সার ব্যাপারে আঁটটিলকে সন্দেহ করেছিলাম তখন আদমপুরে গিয়ে একদিন সব জেনে আসি। যাক আমরা আসল কথায় ফিরে আসি।' পাকা গোয়েন্দার মতো বললো ভোম্বল। 'পয়সা আর কে কে সরাতে পারে। এক মামী নিজে। কারণ তাঁর কাছেই চাবি থাকে। আর মামা। তিনিও বাক্সের চাবি খোলেন।'

মামা দাড়ির ফাঁক দিয়ে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে শব্দ করলেন।

'কিন্তু এখানে আসার পর প্রথম যেদিন পঁয়ষট্টি পয়সা খোয়া গেলো, সেদিন আমি একটা 'ক্লু' পেলাম।'

'কী পেলি ? কুলু কী ?' মামী আবার বোকার মতো শুধোলেন।

'কুলু নয়। ক্লু, মানে সূত্র। ক্যাশবাক্সের গায়ে আমি একগাছা লম্বা দাড়ি দেখতে পেলাম।' বলেই ভোম্বল মামার দিকে তাকালো। মামার মুখখানা তখন প্রকাণ্ড আঁকের মতোই হয়েছে।

'মামা যখন একদিন কলেজ থেকে এসে ঘুমোচ্ছিলেন, আমি তখন চুপি চুপি সেই দাড়িটা নিয়ে মামার দাড়ির সঙ্গে মেপে এলাম। দেখলাম, একই মাপের দাড়ি। সেই থেকে মামার ওপর আমার সন্দেহ হলো, কিন্তু মামা পঁয়ষট্টি নয়া পয়সা নিয়ে কী করেন ? এর পরের দিন মামার জামা-কাপড় সব হাতড়ে হাতড়ে দেখলাম, ঘড়ির পকেটে একটা সিনেমার টিকিটের আধখানা দেখতে পেয়ে বুঝলাম, কি ব্যাপার! মামা লুকিয়ে লুকিয়ে রাত্তিরে হিন্দি-সিনেমা দেখেন, লজ্জায় বলতে পারেন না। যেদিনকার টিকিট, ভেবে দেখলাম, মামা সেদিন ক্লাবে যাই বলে রাত্তির করে বাড়ি ফিরেছিলেন।'

'বলিস কি রে, তোর মামার এই কাণ্ড! ও মা আমি যাবো কোথায়!' মামী চেয়ার থেকে উল্‌টে পড়ে যান আর কি! 'তোর মামাকে যে সবাই ভয় করে রে। সবাই যে বলে, উনি গোমড়া মুখে আঁক কষানো ছাড়া আর কিছু পারেন না। ওঁর পেটে এতো বুদ্ধি!'

'আমি আরো প্রমাণ পেলাম, যখন পাশের বাড়ির ভবদেববাবু একদিন বাজার করে ফেরবার সময় মামার কলেজের হিষ্ট্রির প্রফেসর মিষ্টার সহায়কে বলছিলেন, "জানেন সহায়বাবু,— আমাদের পশুপতিবাবু খুব ছবি দেখেন। আমার সঙ্গে প্রায়ই রাত্তিরের শো-তে দেখা হয়।"

এই বলে পকেট থেকে সিনেমার সেই আধখানা টিকিট বের করে সকলকে দেখালো ভোম্বল। তারপর আর এক পকেট থেকে দাড়িগাছাটা নিয়ে মামার মুখের কাছে এলো মেপে দেখাতে। মামা রাগে ঠকঠক করে কাঁপতে কাঁপতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'অকালপক্ক, ডেঁপো ছোকরা কোথাকার। মামার সঙ্গে এয়ার্কি ?' বলে তিনি ঘর থেকে চলে গেলেন। মামা এতো রেগে গিয়েছিলেন যে, ভোম্বলদের ষ্টেশনে পর্যন্ত পৌছোতে যান নি সেদিন।

●

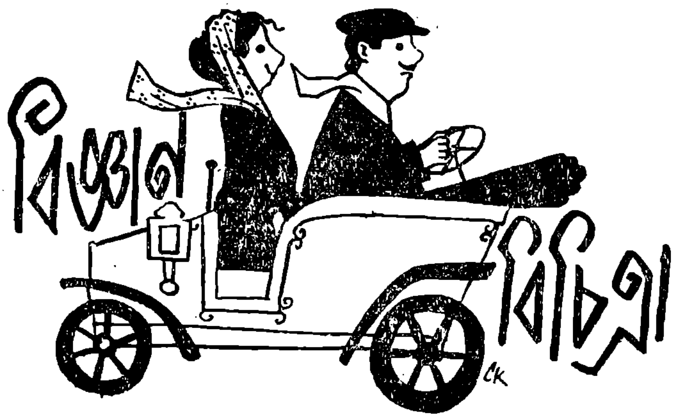

শনিগ্রহের কথা

নারায়ণ চক্রবর্তী

শনির নাম শোনেনি এমন ছেলেমেয়ে তোমাদের মধ্যে একজনও আছে কি না সন্দেহ। যে সব জ্যোতিষীরা হাত দেখেন বা কোষ্ঠী-বিচার করেন, তাঁরা বলেন যে, মানুষের জীবনের সব রকমের মঙ্গল অমঙ্গলের মূলে আছেন শনি। কারোর সময় খারাপ গেলে সবাই বলে, অমুকবাবুর ভাগ্যে শনি লেগেছে। আমাদের পুরাণেও দেখি শনির অপ্রতিহত প্রতাপ। দেবী পার্বতীর আদরের ছেলে গণেশের মুণ্ডুটাই উড়ে গেলো— শনি একবার শুধু তার দিকে তাকিয়ে ছিলো বলে। কী ভীষণ দৃষ্টি বলো তো? হাইড্রোজেন বোমাকেও হার মানায়, কোবাল্ট বোমার কাছাকাছি যাবে। তাই না? শেষটায় কোত্থেকে এক ঐরাবতের মুণ্ডু এনে গণেশের ধড়ে জুড়ে দেওয়া হলো, বেচারা গণেশ গজানন হয়ে গেলেন। কী গেরো।

আমাদের সৌর পরিবারে একটি গ্রহ আছে যার নাম শনি। দেবতাকুলের মধ্যে শনিদেব যেমন বিশিষ্ট, এই শনিগ্রহও তার আর আটটি গ্রহ-ভাইদের চেয়ে একটু পৃথক। এর এমন একটি বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য কোনো গ্রহেরই নেই, সেটি হলো এর চক্র। একটি গোল চাকা শনিগ্রহকে সদাসর্বদা ঘিরে আছে।

শনিগ্রহের এই চক্র নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ঔৎসুক্যের আর অন্ত নেই। অনেকে মনে করেন যে সুদূর অতীতে কোনো এক সময় শনির উপগ্রহ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে এই চক্রটি সৃষ্টি হয়েছে। চক্রটা আসলে ক্ষুদে ক্ষুদে ধাবমান বস্তুকণার সমষ্টি। কোনোটা খুবই ছোটো আবার কোনোটার ওজন

কয়েক টন, প্রত্যেকেই কিন্তু শনিগ্রহকে প্রদক্ষিণ করছে বিপুল বেগে। কেউ কেউ আবার বলেন যে, এই বস্তুকণাগুলো বরফে ঢাকা। এই চক্রের বেধ প্রায় পনেরো কিলোমিটার, তাই শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে এর ভেতর দিয়ে আকাশের অন্যান্য ঐশ্বর্যও মানুষের চোখে ধরা দেয়! চক্রের বেধ পাতলা হলেও তার বহরখানি কিন্তু কম নয়— প্রায় ৫১,৫২০০০ কিলোমিটার। এই বিপুল চাকাটা সেকেণ্ডে পনেরো থেকে একুশ মাইল বগে শনি গ্রহের চারপাশে ঘুরে চলেছে। চক্রটি পাতলা হবার দরুণ শনিগ্রহ যখন পৃথিবীর সঙ্গে কোণ বদলাতে থাকে তখন পৃথিবী থেকে কখনো তার ধারের দিকটিই শুধু দেখা যায়। কখনো দেখা যায় তার বহরের দিকটি। তাই চক্রটি কখনো সরু কখনো মোটা বলে মনে হয় আর প্রতি পনেরো বছর অন্তর এতো সরু হয়ে যায় যে, খুব শক্তিশালী দূরবীন দিয়েও আর তা দেখা যায় না; মনে হয় বুঝি চক্রটি উধাও হয়ে গেছে। তখন চক্রহীন শনিকে বৃহস্পতি বা শুক্র গ্রহের মতোই দেখায়।

এ নিয়ে একটা মজার গল্প আছে। — গল্প নয়, এটি একটি সত্যি ঘটনা।

১৯২১ সালে শনিগ্রহ পৃথিবীর সঙ্গে এমন একটি কোণ রচনা করেছিলো যে, চক্রটি আর দেখাই যাচ্ছিলো না।

কাগজে কাগজে এ খবরটি প্রকাশিত হয়ে গেলো: 'শনি গ্রহের চক্র উধাও! অন্য একটা কাগজ লিখলো: চক্রটি পৃথিবীর দিকে ছুটে আসছে, মহা প্রলয় আসন্ন।'

চারদিকে মহা হৈ চৈ পড়ে গেলো চেতাবানীর মতো। মন্দিরে, গির্জায়, মসজিদে সে কী ভীড়। শনিচক্রের ধাক্কায় পটলতোলার ভয়ে সবাই কম্পমান।

কিছুদিন পরেই চক্রটি আবার দেখা দিলো। প্রথমে খুব সরু আকারে, তারপর চাঁদের কলার মতো বাড়তে বাড়তে পূর্ণ আকারে দেখা দিয়ে পৃথিবীর মানুষের ভয় দূর করলো। এই সময়ে শনিচক্র সূর্যের যতোটা আলো প্রতিফলিত করে, তার পরিমাণ খোদ শনিগ্রহের প্রতিফলিত আলোর চেয়েও বেশি।

শনিগ্রহ সূর্য থেকে প্রায় ৮৮৭,০০০,০০০ মাইল দূরে। সূর্যের চারিদিকে-এর প্রদক্ষিণের গতি হলো প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় ছয় মাইল। সূর্যের চারদিকে ঘুরে আসতে এর সময় লাগে সাড়ে উনত্রিশ বছর। শনিগ্রহও পৃথিবীর মতোই নিজের অক্ষদণ্ডের চারপাশে ঘুরপাক খায় লাটুর মতো। তবে পৃথিবী যেখানে একবার ঘুরপাক খেতে সময় নেয় চব্বিশ ঘণ্টার মতো, সেখানে শনি সময় নেয় মাত্র দশ ঘণ্টা। এই ভয়ানক বেগের জন্য শনিগ্রহের উত্তর ও দক্ষিন খুব বেশি

রকমে চাপা। শনির বিষুব ব্যাস প্রায় ৭৫,০০০ মাইল, অথচ মেরুবিন্দুদ্বয়ের ব্যাস হচ্ছে প্রায় ৬৭,৮০০ মাইল, অর্থাৎ প্রায় ৭,২০০ মাইল কম।

শনি গ্রহে কোনো প্রাণী বা উদ্ভিদ আছে বলে জানা যায়নি। এর বায়ুমণ্ডলে আছে ঘন গ্যাসের আবরণ। শনিগ্রহের ভূত্বকের তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রী-র চেয়েও ১৫০ ডিগ্রী কম। কী ভীষণ ঠাণ্ডা, তাই না?

শনিগ্রহের মোটমাট নয়টি উপগ্রহ আছে, তার মধ্যে সব চেয়ে বড়ো যেটি তার নাম হলো টাইটান। আকারে প্রায় বুধ গ্রহের সমান। শনিগ্রহের নয় নম্বর উপগ্রহটির প্রকৃতি একটু বিচিত্র। এটি শনি থেকে প্রায় আশি লক্ষ মাইল দূরে থেকে প্রদক্ষিণ করছে কিন্তু ঘুরছে পূব থেকে পশ্চিম দিকে, অন্য আটটি উপগ্রহের বিপরীত মুখে। শনিগ্রহের আয়তন পৃথিবীর প্রায় ৭৫০ গুণ।

●

এক যে ছিল

ইন্দ্রজিৎ রায়

এক যে ছিল বীর শিকারী—হাবড়াতে
কেউ পারেনি কভু তারে ঘাবড়াতে।
সোঁদরবনে গিয়ে নাকি
মেরেছিল সে একাকী—
গণ্ডাখানেক ষণ্ডা বাঘা—থাবড়াতে॥

এক যে ছিল বন্ধুলোক—আগরাতে,
শখ ছিল তার জরিদার নাগরাতে।
বৃষ্টিভেজা পথের মোড়ে
চলতে গিয়ে সেদিন জোরে—
পিছলে পড়ে লাগল জুতো—টাগরাতে॥

●

ভূতুড়ে কফি

এ মাসে তোমাদর শেখাবো একটা জলের যাদু। এই খেলার নাম তোমরা দিতে পারো 'ভূতুড়ে কফি'। এ হচ্ছে একটা বৈজ্ঞানিক ম্যাজিক। অর্থাৎ এই খেলাতে প্রয়োগ করা হবে বিজ্ঞানের কেরামতি। বিজ্ঞানের কৌশলে যে সব ম্যাজিক দেখানো হয় সেগুলো প্রায়ই হয় খুব চমকপ্রদ।

যাদুকরের হাতে আছে এক কাঁচের গেলাস ভর্তি কড়া কফি। ডান হাতে এই কফির গেলাস তুলে ধরে যাদুকর দেখালেন তাঁর দর্শকদের। গেলাসটা এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখালেন তিনি। এর পরে বাঁ হাত দিয়ে তিনি টেবিলের ওপর থেকে তুলে নিলেন একটি কাগজের ঠোঙা (চানাচুর ঝালমুড়ি ইত্যাদি যে রকম ঠোঙাতে বিক্রি হয় তেমনি ঠোঙা একটু বড়ো মাপের) এই ঠোঙা দিয়ে কফির গেলাসটা চাপা দিয়ে যাদুকর পড়লেন ম্যাজিকের মন্তর :

বাঘের মাসি বেড়াল ছানা,
খায় না সে তো বাঘের খানা ;
মানুষ-ছাগল খাওয়া মানা
খায় সে শুধু মাখন-ছানা।

মন্তর পড়ে যাদুকরমশাই ঠোঙাটা তুলে নিয়ে দুমড়ে মুচড়ে ফেলে দেন দূরে। সবাই অবাক হয়ে দেখে যাদু-মন্তরের গুণে কফি জল হয়ে গেছে— টলটলে সাদা জল পড়ে আছে গেলাসে। কফির নাম গন্ধও নেই সেখানে!

আগেই তো বলেছি এটা বিজ্ঞানের মজা। রাসায়নিক মাল মসলার কেরামতিতেই সম্ভব হয় এই অদ্ভুত পরিবর্তনের ব্যাপারটা। এ খেলার জন্য ব্যবহার করা হয় দুটো ওষুধ। (১) টিনচার আয়োডিন (২) হাইপো।

১ নং ওষুধটা প্রায় সবার বাড়িতেই পাওয়া যাবে ; কোনো জায়গায় কেটে গেলে যে আয়োডিন তোমরা লাগাও সেই আয়োডিনেই কাজ হবে।

২ নং ওষুধ 'হাইপো' দেখতে অনেকটা ঠিক মিছরির ঢেলার মতো। ফটোগ্রাফির দোকান থেকে এ জিনিস সংগ্রহ করতে হবে।

একটা কাঁচের গেলাসে কয়েক ফোঁটা আয়োডিন দিয়ে তাতে জল মেশাও। এমনটি করলে জলের রং হবে কফির মতো। একটা কাগজের ঠোঙা বানিয়ে নিয়ে তার ভেতরে সুতো দিয়ে এক ঢেলা 'হাইপো' এমন ভাবে ঝুলিয়ে দাও যেন এই ঠোঙা দিয়ে গেলাসটা চাপা দিলে গেলাসের আয়োডিন গোলা জলের মধ্যে এই সুতোয় ঝোলানো হাইপোর ঢেলা ডুবে যায় আপনা থেকে। ঠোঙার ভেতরে থাকার ফলে দর্শকেরা এই হাইপোর ঢেলা কেউ দেখতে পায় না।

এখন মজা হলো এই যে, হাইপো আর আয়োডিনের মধ্যে আছে রাসায়নিক বৈরীভাব। হাইপো আর আয়োডিনে একটা মেশামিশি হলেই এমন এক রাসায়নিক কাণ্ডকারখানা হয় যে, আয়োডিন তার রং পাল্টে ফেলে। এই রং পাল্টানোর ফলে গেলাসে রাখা নকল কফি অর্থাৎ আয়োডিন গোলা জল বৈজ্ঞানিক কৌশলে বর্ণবিহীন টলটলে জল হয়ে যায়।

খুব সাবধান— এই মশলাগুলো কোনোভাবে যেন মুখে না যায়। এগুলো ব্যবহার করবে খুব সাবধানে! এগুলো কিন্তু বিষ!

জরুরী ঘোষণা

পৌষ ১৩৭৪ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেকের চাঁদাও শেষ হলো দ্বিতীয় বছরের। তৃতীয় বছরেও যারা গ্রাহক থাকতে চাও, তারা অবিলম্বে চাঁদা পাঠাতে ভুলো না। ৩১. ১. ৬৮-র মধ্যে তোমাদের কারোর চাঁদা বা চিঠি না পেলে, আগামী সংখ্যা থেকে তাদের পত্রিকা পাঠানো বন্ধ রাখবো।

সম্পাদক
ঝিলিমিলি

সামুদ্রিক গোখরো

রথীন সরকার

তোমরা অনেক রকম সামুদ্রিক জীবের কথা এবং তাদের হিংস্রতার কথাও শুনেছো নিশ্চয়ই। কিন্তু আমি যে সামুদ্রিক প্রাণীটির কথা বলছি তার হিংস্রতা সবাইকে টেক্কা দেয়। এই অদ্ভুত দর্শন প্রাণীটির নাম ফাইসেলিয়া ফাইসেলিম। অবশ্য এর আরো দু'-একটি নাম আছে যেমন— পর্তুগীজ-ম্যান-অব-ওয়ার কিম্বা সামুদ্রিক গোখরো।

পর্তুগীজ-ম্যান-অব-ওয়ার নামটি অনেকটা যেন পর্তুগালের যুদ্ধ-জাহাজের মতো। এদের এই অদ্ভুত নাম কি করে হলো তা কিন্তু জানা যায়নি। তবে বিজ্ঞানীদের ধারণা, পর্তুগালের সমুদ্রোপকূলে এদের প্রথম দেখা যায় বলেই এদের এই নাম দেওয়া হয়েছে। এরা জেলিফিসের সমগোত্রীয়।

ফাইসেলিয়া ফাইসেলিম-এর দৈহিক আকৃতি একখানি উল্টানো নৌকোর মতো। এদের দৈহিক সৌন্দর্য বড়ো অপরূপ। লাল, নীল, সবুজ, বেগুনী নানা রঙের ফাইসেলিয়া ফাইসেলিম যখন দল বেঁধে ভেসে বেড়ায় সে দৃশ্য বড়ো অপূর্ব। এদের এই দৈহিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে বহু নাবিক তুলতে গিয়ে এদের দংশনে প্রাণ হারিয়েছে।

মানুষ-খেকো হাঙর, অক্টোপাস এবং ভয়ঙ্কর হিংস্র প্রাণী ব্যারাকুডার হিংস্রতার কথা তোমরা সকলেই জানো। কিন্তু ফাইসেলিয়া ফাইসেলিম-এর হিংস্রতায় অনেক দুঃসাহসী নাবিকের বুক পর্যন্ত কেঁপে ওঠে। গোখরো সাপের দংশনে মানুষের শরীরে যে যে প্রতিক্রিয়া হয়, এদের দংশনেও ঠিক অনুরূপ প্রতিক্রিয়া হতে দেখা গিয়েছে। তবে এদের বিষের পরিমাণ কম থাকায়, অনেক সময় না মরলেও অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণায় মানুষ অজ্ঞান হয়ে যায়।

এরা দল বেঁধে সমুদ্রের বুকে ভেসে বেড়ায়। এদের ওপরের অংশটি ফাঁপা। এর ওপরে থাকে বায়ু ভর্তি চটকদার রঙের একটা ঝুটি— ঠিক যেন একটা নৌকোর পাল। এরা ইচ্ছামতো ঘুরে বেড়াতে পারে। এদের ওপরের অংশটি রৌদ্রে মাঝে মাঝে শুকিয়ে যায় বলে এরা সেটিকে জলে ভিজিয়ে নেয়।

এতো গেলো ফাইসেলিয়া ফাইসেলিসের ওপরের অংশ। এদের নিচের অংশটি অর্থাৎ যেটি জলের অভ্যন্তরে থাকে সেটি যেন গাছের একগুচ্ছ মুল। সরু সরু লম্বা লম্বা শুঁড়ের দ্বারা এটি গঠিত। সাধারণতঃ শুঁড়গুলি লম্বায় ১০।১৫ ফুট পর্যন্ত হয়। অবশ্য ৪০।৫০ ফুট লম্বা হতেও কখনও কখনও দেখা গিয়েছে। এই শুঁড়গুলি অসম্ভব রকমের শক্ত ও পেশীবহুল। ইচ্ছামতো এরা সেগুলি সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করতে পারে। এদের এই শুঁড়ে থাকে অসংখ্য খুদে খুদে কোষ। শিকার ধরবার সময় এরা শুঁড়ের সাহায্যে শিকারকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে, তাদের দেহে এক ধরণের তীব্র বিষ প্রয়োগ করে। বিষের জ্বালায় শিকার নিস্তেজ হয়ে পড়লে ফাইসেলিয়া ফাইসেলিস তখন সেটিকে উদরপূর্তির কাজে লাগায়। সাধারণতঃ ছোটো ছোটো মাছ, প্লাঙ্কটন, এবং অন্যান্য ছোটো প্রাণীই এদের প্রধান খাদ্য।

গল্প প্রতিযোগিতা (২)

জলপাইগুড়ি টাউনের শ্রীমতী সবিতা দাশ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ৺অমলকুমারের স্মৃতিচারণের উদ্দেশ্যে আমাদের পত্রিকা মারফৎ একটি গল্প-প্রতিযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন।

বিষয়বস্তু ঃ **একটি রূপকথা**। ফুলস্কেপ কাগজের দুই থেকে আড়াই পৃষ্ঠার মধ্যে শেষ হওয়া চাই। পরিষ্কার হস্তাক্ষরে কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখতে হবে। যোগদানকারী গ্রাহক/গ্রাহিকার বয়স ষোল বছরের বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরষ্কার যথাক্রমে ৫৲ ৩৲ ও ২৲ টাকা দামের বই। ফলাফল চৈত্রের ঝিলিমিলিতে এবং পুরষ্কার প্রাপ্ত লেখাগুলি বৈশাখের ঝিলিমিলিতে প্রকাশিত হবে।

৺অমলকুমার স্মৃতি-সাহিত্য-প্রতিযোগিতা (২) এই শিরোনামায় গল্প পাঠাবার শেষ তারিখ ২৯শে ফেব্রুয়ারি।

ঝিলিমিলির আসর

পরিচালনা—**আসরবন্ধু**

মায়ের দয়া

সুভাষ বণিক (১৭৩) বেনাচিতি

হঠাৎ ছোটো বেলার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেলো। আশ্বিন মাস। পুজোর সময়। আমাদের বাড়ির পাশেই মন্দিরে বিরাট দুর্গাপূজা হতো। পাড়ার সার্বজনীন দুর্গোৎসব। বাবা ছিলেন সেই পূজার সেক্রেটারি। কাজেই আমার গর্ব ও আনন্দের শেষ ছিলো না। পাড়ায় অনেকেই সেজেগুজে বেরিয়েছে। আমার বন্ধু নটু, তুলু, বাবু সবাই আজ মনের আনন্দে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। আমিও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছি।

সপ্তমীর সন্ধ্যারতি হয়ে গেছে। লোকের ভিড়ও একটু কম। এর মধ্যেই বাজির আওয়াজে পাড়াটা মাত হয়ে গেছে। চারিদিকেই বাজি ফুটছে ফটাফট শব্দে। সবাই তখন আনন্দে মাতোয়ারা। শুধু আমরা কয়েকজন বন্ধু মনমরা হয়ে চুপচাপ বসেছিলাম। কারো কাছে একটাও পয়সা নেই যে, বাজি কিনি। বাবাকে বলাও চলে না। কাজেই মনমরা হয়ে বসে থাকা ছাড়া আর কি করার আছে? আমাদের মধ্যে নটুই একটু বেশি বুদ্ধিমান। অনেক ভেবেচিন্তে সে এক সময় লাফিয়ে উঠে বললো— 'পেয়েছি, উপায় পেয়েছি।' এই বলে সে যা বললো, তাতে সবার চোখই কপালে উঠলো। আর বুকের ভেতরটাও ছ্যাঁৎ করে উঠলো। আরে রাম, রাম, ঠাকুর-মন্দিরের টাকা কেউ ছোঁয় নাকি আবার! মা-দুর্গা যদি অভিশাপ দেন? না বাবা, তা হবে না।

নটু অভয় দিলো— 'আরে না, না কিছু ভয় নেই, চুপি চুপি যাবি আর প্রণাম করার ছুতোয় মহিষাসুরের পায়ের তলায় রাখা টাকাটা আস্তে আস্তে তুলে নিবি। আর এতো ঠাকুরের উদ্দেশ্যেই বাজি পোড়ানো হবে। এতে মা অভিশাপ দেবেন কেন?'

ওর কথায় মনে মনে একটু অভয় পেলেও কারোরই এগোবার সাহস যোগালো না। শেষে আমি বললাম— 'আমিই যাবো।'

দ্বিরুক্তি না করে আমি এগোলাম মন্দিরের দিকে। ভীড় তখন একটু কমেছে। আস্তে আস্তে মন্দিরে ঢুকলাম। চারিদিক একবার নিরীক্ষণ করে নিলাম। নাঃ, কেউ নেই মন্দিরে। সবাই নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত। এই তো মহাসুযোগ। বুকের ভেতর দুরু দুরু করছিলো। যদি কেউ দেখে ফেলে? তাহলে কি হবে? একেবারে ঠাকুরের সামনে গিয়ে শেষবারের মতো দেখে নিলাম— কেউ আমায় লক্ষ্য করছে কিনা।

নটুর নির্দেশ মতো মহিষাসুরের পদতল লক্ষ্য করেই প্রণাম করেছিলাম। টাকার জন্য যেই হাত বাড়িয়েছি অমনি ঘটলো অঘটন। তাড়াহুড়োর ফলে আমার হাতের ধাক্কা লেগে জ্বলন্ত প্রদীপটা গেলো উল্টে। আর সামনেই মঙ্গলঘটের ওপর ছিলো লাল পেড়ে ক'টি নতুন শাড়ি। তার ওপরই প্রদীপের আগুনটা ছিটকে এসে পড়ায়, আগুন ধরে গেলো কাপড়ে। আমার মুখ তখন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। প্রাণ উড়ে গেছে ভয়ে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছি। হাত পা আড়ষ্ট, নড়াচড়ার উপায়ও নেই।

আগুনটা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। এদিক-ওদিক ধরেও গেলো। ততোক্ষণে ঠাকুরের কাঠামোতেও ধরে গেছে আগুন। আমি কিন্তু সম্মোহিতের মতো ঠায় দাঁড়িয়ে আছি। কোনো দিকে হুঁস নেই।

শুনলাম চারিদিকে একটা সোরগোল উঠেছে। একটা কোলাহল: গেলো— গেলো— আগুন— জল— চেঁচামেচি···হৈচৈ···ছুটোছুটি—

তারপর আর কিছু মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম, তাকিয়ে দেখি বাড়ির বিছানায় শুয়ে আছি। আর মা, বাবা, ডাক্তারবাবু এবং আরো অনেকে আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সবাই বোধহয় উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। আমার জ্ঞান ফিরতে দেখে মা বাবার ধড়ে প্রাণ ফিরে এলো। পরে শুনেছিলাম— সামান্য সামান্য পোড়া ছাড়া আমি নাকি অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গেছি। ঠাকুর অবশ্য অর্ধেকই পুড়ে গেছিলো। তারপর সে বছরই আবার নতুন করে প্রতিমা গড়ে পূজো হলো।

এ সব অতীতের এক টুকরো স্মৃতি। কিন্তু এখনও ঠিক বুঝতে পারিনি সেদিন আমি সাঙ্ঘাতিক অপরাধ করেও দেবীর ক্ষমা পেলাম কি করে? তবে সবই কি মা দুর্গার দয়া? হয়তো তাই। তিনি যে মা। জগজ্জননী। না হলে এমন অপরাধী সন্তানকে ক্ষমা করতে পারেন আর কে?

●

ধাঁধা

১। ত্রিবর্ণে নাম তার জলচর কয়
আদ্যবর্ণ না রহিলে জপে যোগ্য হয়।
মধ্যবর্ণ কেটে দিলে হয় কটুভাষ,
ত্রিবর্ণ একত্র স্নানে সর্বপাপ নাশ।

২। দুই বর্ণ গাত্রবস্ত্র— অর্থতার গাছ,
এক অর্থে বর্ষপূর্ণ, অন্য অর্থে মাছ॥

মহাদেব বিশ্বাস (৩৯৫) শ্রীনারায়ণপুর

৩। তিন আখরে নাম তার খাদ্যে স্থান পায়,
শেষ বর্ণ ছেড়ে দিলে সরকার চায়।
পেট কাটো ফল পাবে অতি উপাদেয়
নর ও বানর আদি সকলের প্রিয়॥

—**শোভনকুমার দত্ত** (২১৬) ব্যারাকপুর

নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে। উত্তর পাঠাবার শেষ তারিখ ৭ই মার্চ ১৯৬৮।

অঙ্ক ভালো লাগা ছেলেটার গল্প

ওঙ্কার দেবরায় (১৮) শিলচর

ন্যাট সেদিন প্রথম গেছে স্কুলে। দাদা হ্যাবের সঙ্গে ওয়াটসন মাষ্টারের কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই, মাষ্টারসাহেব ভ্রূ কুঁচকে বললেন হ্যাবকে, 'এতোটুকু ছেলেকে আনলে কেন? ও আবার কি পড়বে?' 'বয়সের তুলনায় ওকে একটু ছোটো দেখায়, স্যর।'— হ্যাব উত্তর দিলো। 'হুঁ, যাও বসোগে ঐ বেঞ্চে।'— মাষ্টার-সাহেবের কথায় ন্যাট বসলো গিয়ে নির্দিষ্ট বেঞ্চটায়।

ন্যাট খুব অঙ্ক কষতে ভালোবাসতো। কিন্তু ওয়াটসন স্যর যে ন্যাটের মতো ছোটো ছেলেদের অঙ্ক কষতে দেন না। তবে ন্যাট হতাশ হয় না। সে ভাবে, আগামী বছর সে যখন বড়ো হবে, তখন সে স্কুলে অঙ্ক করতে পারবে।

বছর ঘুরে এলো। একদিন একটা ছেলেকে খুব বড়ো একটা অঙ্ক কষতে দিয়েছেন মাষ্টারসাহেব। ন্যাট দেখেই বলে উঠলো, 'আমাকে ঐরকম একটা অঙ্ক দেবেন, স্যর?'

'না। ছোটো ছেলেরা ওসব অঙ্ক পারবে না।'

সেদিন রাত্রে ন্যাট বাবার কাছে নালিশ করে, 'বাবা, মাষ্টারসাহেব শুধু আমাকে ছোটো ছোটো অঙ্ক দেন। ওগুলো আমি মুখে মুখে বলে দিতে পারি। তিনি কেন আমাকে বড়ো অঙ্ক দেন না।'

বাবা ছেলের কথায় মনে মনে খুশি হন। বলেন, 'কোনো ছেলের মুখে এমন কথা এই প্রথম শুনলাম।' তারপর তিনি মাষ্টারসাহেবকে চিঠি দিয়ে দেন— যাতে তিনি ন্যাটকে বড়ো বড়ো অঙ্ক দেন।

মাষ্টারসাহেব চিঠি দেখেই রাগে ন্যাটকে শ্লেট জুড়ে একটা অঙ্ক দিলেন। ন্যাট কিছুক্ষণের মধ্যে অঙ্কটা করে ফেলে। 'স্যর, আমাকে আরেকটা অঙ্ক দিন।'

'কেন, আগের অঙ্কটা বুঝি শক্ত?'

'না স্যর, ওটা তো করে ফেলেছি।'

'করে ফেলেছো!' কই দেখি? এ্যাঁ, কে করে দিয়েছে এটা?'

'কেউ না, স্যর।'

গর্জে ওঠেন মাষ্টারসাহেব: 'মিছে কথা। সত্যি বলো।'

'মিছে কথা আমি বলি না, স্যর।' —ন্যাটের বলিষ্ঠ উত্তর।

'সত্যি কথা বলবার জন্য কাল পর্যন্ত সময় দিলাম। যদি সত্যি কথা না বলো মার খাবে।' মাষ্টারসাহেব রাগে যেন কাঁপছেন।

সেদিন রাত্রে ন্যাট ভালোকরে খেতে পারে না। ব্যাপার লক্ষ্য করে হ্যাব বললো, 'কি হয়েছে, ন্যাট? মুখ ভার কেন?'

ন্যাট সব ঘটনা খুলে বলে।

পরদিন সকালে হ্যাব মাষ্টারসাহেবকে বলে, 'যদি আপনার কোনো সন্দেহ হয়, তবে আরেকটা অঙ্ক দিন— ও আপনার পাশে বসে করবে।'

ওয়াটসনমাষ্টার রাজি-হন। আরেকটা বিরাট অঙ্ক দেন ন্যাটকে। মাষ্টার সাহেব রাগ দেখে ন্যাটের ভয় করে। তবুও মাথা ঠাণ্ডা রেখে অঙ্কটা করে ফেলে। বলে, 'এই নিন স্যর।'

এই ছেলেটি কে জানো? ইনিই হচ্ছেন ন্যাথানিয়েল বোভিচ্। প্রায় দুশো বছর আগে তাঁর জন্ম হয় আমেরিকার সালেম শহরে। স্কুলে তাঁর বেশিদিন লেখাপড়া হয়নি। কেবলমাত্র একাগ্রতা আর সাধনার জোরে তিনি আয়ত্ত করেছিলেন নৌ-চালনা বিদ্যা— যা ছিলো সেদিনের এক কঠিনতম কাজ। তাঁর লেখা বই আজও নৌ-বিশারদের কাছে অতুলনীয়। অঙ্ক, জ্যোতির্বিদ্যা আর জরিপবিদ্যা এবং তিন-চারটে বিদেশী ভাষা এর জন্য তিনি শিখেছিলেন। বড়ো হলে তাঁর আত্মজীবনী 'Carry on' পড়ে নিও।

●

খোকার স্বপ্ন

সমরেন্দু মুখোপাধ্যায় (৩০৯) ধানবাদ

'নিত্য রাতে ঘুমের ঘোরে স্বপন দেখি মাগো—'
খোকন জানায় মায়ের কাছে: 'জানো তুমি হাঁ-গো!
কোথায় থাকে রাজার ছেলে, অজানা কোন্ দেশে—
স্বপন হয়ে দেয় যে দেখা, ঘুমের মাঝে এসে।
সেদিন শোনো— চশমা পরে ঘুমিয়ে ছিনু আমি।
রাজপুত্তুর ছুটিয়ে ঘোড়া আসলো তবু নামি।
মানলো না সে কোনো রকম বাধা এবং নিষেধ,
স্বপনসাজে এলো ঠিকই— এমনি তাহার জেদ।
আজকে যদি ঘুমাও মাগো আমার বিছানাতে—
স্বপনকুমার নামবে দেখো— তোমার আঁখিপাতে।'

পুষ্পেন সরকার

সুব্রত কাপ: আন্তরাজ্য স্কুল ফুটবল বা জুনিয়র ডুরাণ্ডের খেলায় পর নিকোবর* স্কুলের ছেলেরা ৩-১ গোলে কোহিমা গভর্ণমেণ্ট স্কুল দলকে হারিয়ে উপর্যুপরি দ্বিতীয়বার সুব্রত কাপ বিজয়ী হয়েছে। গত ১৫ই নভেম্বর থেকে শুরু করে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত দিল্লিতে এই প্রতিযোগিতার আসরে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের শ্রেষ্ঠ স্কুল ফুটবল দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিকোবর স্কুলের এই উপর্যুপরি জয়লাভ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। বিশেষ করে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের অগণিত স্কুলের মধ্যে কার নিকোবরের মতো ছোটো একটা দ্বীপপুঞ্জের সীমিত শক্তি যে কতো ক্ষুরধার এবং সুগঠিত সেটা তাদের সাফল্যের মাপকাঠিতে প্রমাণিত হয়েছে।

ফাইন্যালে পরাজিত কোহিমা দলও সুখ্যাতির দাবি রাখে; সেমি-ফাইন্যালের খেলায় তারা গতবারের রানার্স জালন্ধরের ষ্টেট স্পোর্টস স্কুলকে ৩-০ গোলে পরাজিত করে। এবারের প্রতিযোগিতায় সব থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা-মূলক খেলা হয়েছে কালিম্পং স্কটিশ ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট স্কুল এবং কার নিকোবরের খেলাটি। কার নিকোবর তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর অতি কষ্টে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর অঞ্চলের কালিম্পং স্কুলকে হারিয়ে ফাইন্যালে ওঠে।

রোভার্স কাপ: একদিন গোলশূন্যভাবে খেলা শেষ করার পর দ্বিতীয় দিনে ২-০ গোলে প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোহনবাগানকে হারিয়ে ইষ্টবেঙ্গল তৃতীয়বার রোভার্স বিজয়ী হয়েছে। ইষ্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়, সভ্য এবং সমর্থক আজ সকলেই আনন্দের জোয়ারে ভাসছেন। ডুরাণ্ড এবং আই-এফ-এ শীল্ড ফাইন্যালে মোহনবাগান এবং ইষ্টবেঙ্গল অনেকবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও কুপারেজ মাঠে রোভার্স ফাইন্যালে এইটাই ছিলো দু'দলের প্রথম সাক্ষাৎকার।

এর আগে ১৯৪৯ সালে এবং ১৯৬২ সালে দু'বার ইষ্টবেঙ্গল রোভার্স কাপ বিজয়ী হয়।

ইষ্টবেঙ্গল এবারে ফাইন্যালে ওঠার পথে সব থেকে শক্ত বাধার সম্মুখীন হয়েছিলো সেমিফাইন্যালে লীডার্স ক্লাবের বিরুদ্ধে। এর আগে বোম্বাই-এর লীগ চ্যাম্পিয়ন মহারাষ্ট্র পুলিশকে ৫-১ গোলে এবং কোয়ার্টার ফাইন্যালে মফৎলাল স্পোর্টসকে ৪-১ গোলে হারাতে ইষ্টবেঙ্গলের বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিলো।

মোহনবাগানের সূচনা তেমন ভালো হয়নি। অনেকাংশে হীনবল বোম্বাইর রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রথম দিন ১-১ গোল এবং দ্বিতীয় দিনে ২-০ গোলে বিজয়ী হলেও খেলার বিবরণ পড়ে মোহনবাগানের সমর্থকেরা কেউ খুশি হতে পারেন নি। কিন্তু কোয়ার্টার ফাইন্যালে শক্তিশালী বর্ডার সিকিউরিটি পুলিশের বিরুদ্ধে মোহনবাগান সত্যিই উন্নত ক্রীড়ামানের পরিচয় দিয়ে ৪-১ গোলে জয়লাভ করে। তারপর কলকাতার অপরাজিত মহমেডানকে ৩-১ গোলে হারিয়ে যখন ফাইন্যালে ওঠে তখন মোহনবাগানের সাফল্য সম্বন্ধে অনেকেই আশাবাদী হয়ে পড়েন।

মোহনবাগান ইষ্টবেঙ্গলের ফাইন্যাল খেলা খুব উচ্চাঙ্গের হবে বলে যারা আশা করেছিলেন, তাঁদের আশা মেটেনি। সাধারণতঃ মোহনবাগান ইষ্ট-বেঙ্গলের খেলায় উন্নত ফুটবলের পরিচয় মেলে না। এ খেলায় দুই দলই জয়-লাভ করা থেকে অমীমাংসিত ভাবে খেলা শেষ করাই বেশি কাম্য বলে মনে করেন। যার ফলে প্রথম দিনের খেলা গোলশূন্যভাবে শেষ হয়। তবে প্রথম দিনের খেলায় দুই দলের খেলোয়াড়েরাই প্রকৃত খেলোয়াড়োচিত মনোভাবের পরিচয় দেন।

দ্বিতীয় দিনের খেলার মানও খুব উঁচু হয়েছে, বলা যায় না। বিশেষ করে খেলার শেষের দিকে দুই দলের খেলোয়াড়দের মাঝে মাঝে দৈহিক শক্তি প্রয়োগ করে খেলতে দেখা যায়। মোহনবাগানের ষ্টপার সি. প্রসাদ না খেলায় দলের রক্ষণ-ভাগ দুর্বল হলেও মোহনবাগানের খেলোয়াড়েরা শেষ পর্যন্ত তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালায়। কিন্তু ইষ্টবেঙ্গলের ফরোয়ার্ডেরা সমন্বয়পুষ্ট খেলা খেলে এবং রক্ষণ-ভাগ অনমনীয় দৃঢ়তায় অবিচল থেকে প্রতি অর্ধে একটি করে গোল করে বিজয়ী হয়। এবারের রোভার্সে ইষ্টবেঙ্গল যে শ্রেষ্ঠ দল তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ক্রিকেট

জীবনময় দত্ত

কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় এখন তোমরা ক্রিকেটের আসর বসিয়ে দিয়েছো। অষ্ট্রেলিয়ায় চোখ জুড়ানো নরম ঘাসের কার্পেটে ভারত-অষ্ট্রেলিয়ার শক্তির লড়াই শুরু হয়েছে। সুতরাং এসো আমরা এই অবসরে ক্রিকেট সম্বন্ধে দু-একটা টুকিটাকি আলোচনা করি।

তোমরা তো জানো যে ক্রিকেট ইংরেজী শব্দ। খাঁটি বাংলায় ক্রিকেটের অর্থ যারা জানো না, তারা শুনলে হাসবে— বাংলায় ক্রিকেট মানে ঝিঁঝিঁ-পোকা। ইংরিজী অভিধান খুললে দেখতে পাবে লেখা আছে— এক ধরণের বাইরের খেলা। ব্যাট, বল আর উইকেটের সাহায্যে প্রতি দলে ১১ জন করে ২ দলের খেলা। কোথায় ঝিঁঝিঁ পোকা আর কোথায় খেলা। একটু অবাক হবার মতো শোনালেও এটাই সত্যি। ইংরেজদের জাতীয় খেলা সুতরাং ইংরিজি নামই চলবে এতে আর অবাক হবার কি আছে?

এবার আর একটা নতুন কথা বলছি। ক্রিকেট শব্দটার উৎপত্তি হয় ব্যাট থেকে। ক্রিকেটের আদিতে ব্যাটের নাম ছিলো 'ক্রুকেড'। সহজ বাংলায় বাঁকা লাঠি। অনেকটা আজকালকার হকি ষ্টিকের মতো। তখনকার খেলায় বল গড়িয়ে দেওয়া হতো। ফলে ঐভাবে তৈরি ব্যাট বা ক্রুকেড দিয়ে মারায় সুবিধা পাওয়া যেতো। ক্রমে সময়ের চেহারা পাল্টাবার সঙ্গে সঙ্গে খেলারও অনেক কিছু অদল-বদল হলো। হাত ঘুরিয়ে বল দেবার চলন হলো। ক্রুকেডের আকারেও পরিবর্তন এলো। অনেক বিবর্তনের পর ব্যাটের আজকের রূপের আগমন। আইন করে ব্যাটের আয়তন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হলো। এভাবেই ক্রিকেটের এক প্রধান অঙ্গ ব্যাটের সৃষ্টি।

ক্রিকেট খেলতে গিয়ে তোমরা অনেক ধরণের শব্দের সঙ্গে পরিচিত। যেমন পিচ, ক্রিজ, আউট, এ. বি. ডবল্যু, সেঞ্চুরি, হ্যাট্রিক ইত্যাদি অজস্র নিয়ম-কানুনের শব্দ। এদের সবগুলোর ব্যাখ্যা এখানে সম্ভবব নয়। শুধু বোলিং-এ হ্যাট্রিক কি করে হয় আর এই শব্দটা কি করে চালু হলো সেই কথাই বলবো। পরপর তিনজন ব্যাটসম্যানকে কোনো রাণ না দিয়ে আউট করে দিতে পারাকে হ্যাট্রিক বলে। বোধহয় ১৮৫৮ সালের কথা। কোনো এক খেলায় একজন বোলার পরপর তিনটি বলে তিনজন খেলোয়াড়কে শূন্য রাণে আউট করে দেন। তাঁর এই অসামান্য সাফল্যে একজন উৎসাহী দর্শক তাঁকে একটি হ্যাট উপহার দেন! তারপর থেকেই হ্যাট্রিক কথাটির শুরু।

ঝিলমিলির কথা

ছোট্ট বন্ধুরা,

পৌষ তো শেষ হয়ে গেলো, এমন সময় শীতটা আবার জমিয়ে কামড় দিতে শুরু করলো। ভালোই হলো, শীতের সময়েও যদি একটু কাজ করে ঘামতে হয়, তাহলে বড়োই বিশ্রী ব্যাপার হয় না? সারা পৌষে একবার শীতের দেখা পাওয়া গেলো না —যাই হোক, মোটে শীত না পড়ার চেয়ে তবু তো মাঘের শুরুতে পড়লো।

শীতকালে শীত না পড়লে অনেক অশুভ ঘটতে পারে। শীত পড়াতে হয় তো শুভের সূচনা হলো।

নতুন বছর তো শুরু হয়ে গেছে। তোমরা সকলে অনেক অনেক নতুন বই পেয়ে নিশ্চয় খুব আনন্দ করছো। নতুন বই নিয়ে শুধু আনন্দ করলে চলবে না। মন দিয়ে পড়াশুনা করতে হবে, তোমরাই ভবিষ্যৎ ভারতের আশা ভরসা। তোমাদের ওপরেই ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। কাজেই তোমরা নতুন উদ্যমে লেগে, যাও— যাতে আগামী দিনে ভারতের সব অভাব অভিযোগ দূর হয়ে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ আসনে আমাদের দেশ স্থান পায়। নিজের কল্যাণে, দেশের কল্যাণে যাতে তোমরা

নিজেদের নিয়োগ করতে পারো সেজন্য নিজেদের তৈরি করো, তাহলেই হবে, ছাত্রবয়সের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার।

১৫ই জানুয়ারি, বাংলা শিশু-সাহিত্যের সর্বজনপ্রিয় আনন্দস্রষ্টা ও গল্পদাদুর আসরের যাদুকর নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন। মাত্র কয়েক বছর আগে অকালে আমরা আমাদের অতি প্রিয় এই লেখকটিকে পৃথিবী থেকে হারিয়েছি। কিন্তু তিনি না থাকলেও তাঁকে আমরা কখনোই ভুলতে পারবো না। তাই তাঁর জন্মদিনে আমরা আমাদের শ্রদ্ধা জানাই।

মাত্র কয়েকদিন পরেই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ আর বীর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর জন্মদিন ২২শে ও ২৩শে জানুয়ারি। এই জন্ম-বার্ষিকী দুইটি তোমরা নিশ্চয় সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত করবে।

কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথাও এখানে স্মরণ করা দরকার। তাঁর ১৪৫তম জন্মদিনে তাঁকে আমাদের প্রণাম জানাচ্ছি। আর ভারতের স্মরণীয় ২৬শে জানুয়ারী সাধারণতন্ত্র দিবসও তো এসে গেলো। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, সমাবেশ, খেলাধূলা ও মিলনমেলার আয়োজন করে ঐ দিনটি সাড়ম্বরে পালন করো।

শুভার্থী
সম্পাদক

ছোটোদের মুখে হাসি ফোটাতে হলে তাদের হাতে দিন

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়-এর

মা-কালীর খাঁড়া ২৲ ভালো ভালো গল্প ২৲

মণিলাল অধিকারীর

লাল শঙ্খ ২৲

নবেন্দু ঘোষের

কাঞ্চনপুরের ছেলে ৪৲

বুদ্ধদেব বসুর

এলোমেলো ২৲

বিষ্ণু মুখোপাধ্যায়ের

কফিন জাহাজ ৩৲

সুনির্মল বসুর

গুঞ্জবের জন্ম ২৲

শৈল চক্রবর্তীর

গল্পকথার দেশে ২৲

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর

রবিনসন্ ক্রুশো ২৲ ভালো ভালো গল্প ২৲

শ্রীখেলোয়াড়ের

নানান খেলার রাজা ১·৮০

আশা দেবীর

মুস্কিল আসান ২৲

সঙ্কলন গ্রন্থ

ভূতুড়ে গল্প ১০৲

পশুরাজ্যের কাহিনী ৮৲

পঞ্চরত্ন ৮৲

সতীকান্ত গুহর

মিশরের উপকথা ২৲

হেরমান মেলভিলের

মবি ডিক ২৲

শ্রী প্রকাশ ভবন

১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

ফোন : ৩৪-৮৮৩৭

চিত্তজিৎ দে কর্তৃক ১৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ১২, ফোন : ৩৪-৮৯৩৭ থেকে প্রকাশিত এবং সম্বোধি মুদ্রণ প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৪বি ব্রজনাথ মিত্র লেন, কলকাতা ৯ থেকে মুদ্রিত।